খতিয়ান

*   *   *

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ষ্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা.

খতিয়ান

সে আটকে গেল এ এলাকার বস্তিতে তার বন্ধুর ঘরে। কার কাছে হদিস পেয়ে বিশ পঁচিশ জনের একটা দল হৈ হৈ করে ছুটে আসছিল তার রক্তের খোঁজে। টের পেয়ে বন্ধু তাকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল ঘরের মধ্যে ভাঙা তক্তাপোষটার নিচে।

ভেগেছে। আগেই ভেগেছে।

ভেগেছে? খুনের নেশায় মাতাল মানুষগুলি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষুব্ধ হল, ভাগতে দিলি কেন? তোকেই মারা উচিত এক ঘা।

এত নিচু তক্তাপোষের নিচে শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, বন্ধু ছেঁড়া মাদুর আর চট বিছিয়ে দেয়, একটা তেলচিটে ওয়াড়হীন বালিশও দেয়, বালিশটা পাথরের মত শক্ত কিন্তু আস্ত। অন্য একটা তালি মারা একটা নরম বালিশ আছে, কিন্তু তুলো বেরোয় একটু নাড়া চাড়া লেই। সেইখানে বন্ধুর ঘরের নিচু তক্তাপোষের নিচে বেশীর ভাগ এ গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থেকে তার কাটে পরদিন রাত্রে বস্তিতে আগুন লাগা পর্যন্ত।

সে থাকে বড় রাস্তার পুব এলাকার বস্তিতে। দুটি বস্তিই অবশ্য বড় ার খানিকটা তফাতে, দুপাশেই ইটের বাড়ির এলাকা ভেদ করা পথ

অতি নোংরা অতি সংকীর্ণ হয়ে বস্তিতে পৌঁচেছে। বস্তি দুটিকে যোগ দিয়ে লাইন টানলে বড় রাস্তার সঙ্গে খানিক তেরচা হবে। বড় রাস্তার বড় মোড়টার পর থেকে দক্ষিণের বাঁক পর্যন্ত সায়েব পল্লী। রাস্তার দুদিকের এলাকার এই বস্তিগুলি তুলে দিয়ে আধুনিক ধাঁচের ইঁট কংক্রিটের বাড়ি তুলবার পরিকল্পনা ও আয়োজন চলছে কিছুদিন ধরে।

বিশেষ দরকার থাকলেও আজ এদিকে আসা বোকামি হয়ে গিয়ে ছিল তার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অবস্থা এমন খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, এমন লহমায় লহমায় ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে থাকবে চারিদিকে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সে তা ভাবতেও পারেনি।

তুই শালা একটা আস্ত উল্লু! তাকে গুম ক'রে ফেলবার আয়োজন করতে করতে বন্ধু বলেছে রাগ ক'রে গাল দিয়ে।

তুই শালা ভাল্লু! সে অবশ্য জবাব দিয়েছে সমানে, কিন্তু কেউ তারা সুখ পায়নি এই দোস্তির আলাপে। আতঙ্কে খিঁচ ধ'রে গেছে তখন দুজনেরি বুকে। এক কারখানায় খাটবার দোস্তিতে, এই সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটে জয়ী হবার দোস্তিতে হঠাৎ কেমন যেন চিড় খেয়ে গেছে। দু'জনেই তারা কেমন একটা দিশেহারা অসহায় ভাবের সঙ্গে অনুভব করে যে তাদের মিল আছে, তারা বন্ধু বটে, কিন্তু আর যেন এক নয়,—দু'জনে তারা দু'দলের হয়ে গেছে, দারুণ আক্রোশে হন্যে হয়ে যে-দু'টি দল চালিয়েছে হানাহানি খুনোখুনি লুটতরাজ আগুন দেওয়া। হৈচৈ হল্লার আওয়াজ এসে অবিরাম ভয় চকিত মনে হানা দিয়ে সচেতন করে রাখছে যে দু'দলে ভাগ হয়ে থেকেও এতদিন তারা অনায়াসে এক সঙ্গে সভা-শোভাযাত্রা ধর্মঘট পিকেটিং পুলিসের সাথে লড়াই সব কিছু করে এসেছে, আজ পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরেছে সেই দল দু'টি।

দু'জনেরি খারাপ লাগে।

লে বিড়ি লে। চটপট ফুঁকে লে বিড়ি।

বন্ধু আধপোড়া বিড়িটা চালান করে দেয় চৌকির নিচে।

কোলের ছেলেটাকে মাটিতে আছড়ে বসিয়ে কাঁদায় বন্ধুর বৌ, কান্নায় কান না দিয়ে চাপা গলাতে বলে, যত আপদ জোটে বাবা। কি হবে এখন!

জোরে রাগ প্রকাশ করার উপায় নেই। নিচু গলায় যতটা পারে ঝাঁঝ ঢেলে বন্ধুর বৌ একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে চলে তার ঘরে এভাবে মানুষটার চড়াও হওয়ার বজ্জাতির। রেশন যা আছে ঘরে টেনেটুনে দুটো দিন নিজেদের মুখে দু'মুঠো গোঁজা চলত তাদের, যোয়ান-মদ্দ মুখ একটা বাড়ল। তাছাড়া, মানুষ সব ক্ষেপে গেছে, দয়া-মায়া বিচার-বিবেচনা নেই কারো। জানাজানি হয়ে গেলে না জানি কি-দশা হবে তাদের। গজর গজর করতে করতে বন্ধুর বৌ ভাত রাঁধে, বন্ধুকে বাইরে দাওয়ায় পাহারা রেখে ভেতর থেকে দরজায় হুড়কো দিয়ে তাকে চটপট খাওয়ায় তাগিদের চোটে গিলিয়ে দেওয়ার মত, তারপর আবার তাকে চৌকির নিচে পাঠিয়ে এঁটো বাসন তুলে দরজা খুলে আগে উঁকি মেরে এদিক ওদিক ভাল ক'রে দেখে নিয়ে বাইরে আসে। তাকে লুকিয়ে রেখে পাড়ার প্রতিহিংসায় উন্মাদ মানুষগুলির কাছে অপরাধ করার অনুভূতি আর ধরা পড়লে শাস্তির ভয়টা স্বামীর চেয়ে তার অনেক বেশী তীব্র। আপদ বিদায় ক'রে স্বস্তি পাবার সহজ উপায়টার কথা তবু কিন্তু একবারও তার মুখে শোনা যায় না।

দিনদুপুরেও চৌকির নিচে পাঁশুটে আঁধার। এসব ঘরের আঁষটে সোঁদা গন্ধ তার অভ্যস্ত, তবে এখানে গন্ধটা বড় উগ্র। তার গা বেয়ে

আরশোলা চলাফেরা করে, হরদম মশা কামড়ায়, মাঝে মাঝে পোকা। বাইরে যে কাণ্ড হচ্ছে তার বাড়ানো-ফাঁপানো বীভৎস বিবরণ আর বীভৎসতর গুজবের কথা শুনতে শুনতে নিজেকে তার কখনো মনে হয় মরা মানুষ, কখনো জ্বরো রোগী, কখনো বারুদ-ঠাসা বোমা। বুড়ি মা আর বৌ-ছেলেমেয়ের ভাবনা গোড়ার দিকে বরফের ছুরির মত কুরিয়ে কুরিয়ে কাটছিল তার বুকের ভেতরটা—ধীরে ধীরে তার মধ্যেই ফেঁপে গেঁজে উঠে দুর্ভাবনাটা শতগুণ জোরালো এমন একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে থমথম করছে যে সে যেন ধরতে বুঝতে পারছে না কার জন্য বা কিসের জন্য এই বিষম কষ্ট। আনমনে হঠাৎ গায়ে ঝাঁকি দিয়ে উঠতে গিয়ে নাকটা তার ছেঁচে যায় চৌকির কাঠে, চোখ ফেটে জল আসে সেই চিকন ধারালো ব্যথায়। এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার লজ্জা দুঃখ অপমানে আরেকবার ফুঁসে ওঠে তার মন। বাইরে থেকে সে যেন শুনতে পায় যে কোন পথে যখন খুশি যেদিকে খুশি তার চলাফেরা করার অধিকারের ডাক, অনুভব করে ভেতরের জোরালো তাগিদ গটগট ক'রে বাইরে বেরিয়ে যাবার, যা হবার তা হবে। গা থেকে কয়েকটা আরশোলা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে প্রথমে সে টের পায় ঘামে চপচপ করছে তার শরীরটা, তারপর খেয়াল করে গুমোটের গরমে দম তার প্রায় আটকে আসছে। অন্ধ আক্রোশে, অসহ্য বিদ্বেষে দাঁতে দাঁত লেগে যায় তার। দুনিয়া নিপাত যাক, খতম হোক মানুষের চিহ্ন। উঠে গিয়ে এই ঘরে প্রথমে আগুন দিয়ে বঁটি লাঠি চ্যালাকাঠ যে কোন হাতিয়ার নিয়ে সে বাইরে বেরোবে, যাকে সামনে পাবে তাকেই খুন করতে করতে মরবে নিজে। ওঃ, এত সে গরিব—

গরিব? আবার খেয়াল হয় তার যে সে গরিব, আরেকবার আশ্চর্য

হয়ে সে ভাবে যে একথাটা ভুলে গিয়ে এতক্ষণ আবোলতাবোল কী সব ভাবছিল। গরিব ছাড়া আর কি। সে গরিব, এ বস্তির সবাই গরিব।

পরদিন বস্তিতে আগুন লাগার হট্টগোলের মধ্যে সে মরিয়া হয়ে রওনা হল তার নিজের বস্তির দিকে। বন্ধুর কাছেই শোনা গেল, সে বস্তিতেও নাকি আগুন লেগেছে।

কি করবি এবার? এযে মুস্কিল হল! বন্ধু বলে আপশোসের সঙ্গে।

ঠিক আছে।

সোজা পথে যাওয়া যাবে না, চেহারা পোষাক দুই-ই তার ছাপমারা! এদিক দিয়ে ঘুরে সায়েবপাড়া হয়তো সে পৌছতেও পারে কোনরকমে প্রাণটি নিয়ে। না যদি পৌছতে পারে, প্রাণটা যদি যায়, যাবে। সে কাউকে মারেনি, কাউকে মারতেও চায় না, তবু যদি তাকে মরতে হয় যতক্ষণ পারে লড়াই ক'রে মরবে, আর সে গ্রাহ্য করে না মরণকে। সায়েবপাড়া থেকে দুটো ঘোরা পথ আছে তার বস্তিতে যাবার, বড় রাস্তায় হয়তো এখন সামনাসামনি লড়াই চলছে দুটো বস্তিতে আগুন লাগার জের হিসাবে। সায়েবপাড়া পৌছে ঠিক করা যাবে কোন পথে যাওয়া নিরাপদ।

প্রায় আনমনে চলতে থাকে সে। মিছামিছি যারা বোকার মত নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে তাদের সম্বন্ধে একটা গভীর অবজ্ঞার ভাব জেগেছে তার মধ্যে। ওরা তুচ্ছ, ওরা বাজে, বয়স্ক মানুষ নয়, হিংসুটে বজ্জাত বাচ্চা মাত্র। হাজার দশহাজার মিলে একসাথে যদি তেড়ে আসে ওরা, সে দুটো ধমক দিলে আর দু'চারটে চড়চাপড়

কষিয়ে দিলে সব কটা কেঁদে ফেলবে, পালিয়ে যাবে। বস্তির আগুনে লাল হয়ে গেছে আকাশ, নীল তারা ঝকমক করছে। বস্তি এলাকার পর ইঁটের বাড়ির এলাকায় জনশূন্য স্তব্ধ পথ, ইঁটপাটকেল ভাঙা বোতল ছড়ানো, আর কতকগুলি মানুষের দেহ। পচা গন্ধের তীব্রতায় মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, মনে হয় বন্ধুর বস্তির ঘরে যেন ফুলের সুবাসে ভরপুর ছিল চৌকির তলাটা, সেখান থেকে যেন সে পচা গ্যাসের কারখানায় নেমে এসেছে। বস্তির আগুন থেকে ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে মানুষের মাংসপোড়া গন্ধ আকাশে উঠছে।

সে দাঁড়ায়, দুটি শবের পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে পাশ কাটিয়ে যেতে না পেরে। পরস্পরকে তারা হয় তো মারেনি, কাউকে তারা একেবারে মারতে চেয়েও ছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই, শুধু পোষাকের তফাতের জন্যই হয় তো শত্রু হিসাবে তাদের মরতে হয়েছে, কিন্তু মরার পর রাস্তায় পড়ে আছে ঠিক বন্ধুর মত ঘনিষ্ঠভাবে। মাথা এত কাছাকাছি যে মনে হয় যেন ঠেকে আছে, রাস্তার ধুলোয় এলানো একজনের হাতের ওপর আরেকজনের হাত।

ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে, গ্রহ-তারার অনন্ত রহস্যের আড়ালে যিনি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন তাকে শুনিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মড়াপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের? মাংসপোড়া গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর কোনটা মুসলমানের?

কে যায়?

আমি।

কোথায় যাবে?

হাসপাতাল।

সায়েব পাড়ার বড় রাস্তা পর্যন্ত পথটুকু যেতে বারচারেক প্রাণের আশা ছেড়ে দিতে হয় তাকে। সে একা বলে, এই ভীষণ অবস্থায় এই বিপজ্জনক পথে সে একেবারে একা চলছে বলে, বোধহয় ভীত-ত্রস্ত উত্তেজিত মানুষগুলি তাকে মারেও না, ধরেও নিয়ে যায় না। তাকে অনেক উপদেশ আর আদেশও শুনতে হয় ফিরে যাবার, বোকামি না করবার। এ মন্তব্যও সে শোনে কয়েকবার, লোকটা পাগল নাকি!

সায়েবপাড়ার বড় রাস্তায় পা দিতেই যেন নতুন এক জগতে পৌঁছায় সে। জ্যোৎস্নার মত মিঠে গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোয় পরিচ্ছন্ন চওড়া অ্যাসফল্টের পথটিতে যেন রাশি রাশি শান্তি ও শুচিতা ছড়ানো। দু'দিকে বাগান ও লনওয়ালা ছবির মত বড় বড় বাড়ি, আলোয় ঝলমল করছে। উচ্ছৃঙ্খল হাসি ও গানবাজনা ফুলবাগিচা ডিঙিয়ে মৃদু ব্যঙ্গ হয়ে ভেসে আসে তার কানে। এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে। রাস্তা-ঘেঁষা একটি বাড়ি থেকে পিয়ানোর অতি মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ শুনে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তের মত সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোন হ্যায়? ক্যা মাংতা?

গেটের কাছ থেকে খাকি পোশাক পরা অস্ত্রধারী একজনের হাঁক আসে।

জবাব না দিয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করে। ঘুরপথের কথা ভুলে গিয়ে বড় রাস্তা ধরেই সে এগিয়ে চলে—কিছুদূর থেকে এই রাস্তার ওপরেই সংঘর্ষের কোলাহল ভেসে আসছে শুনতে পেয়েও। তার কানে তখনো পিয়ানোর মিষ্টি টুংটুং শব্দ দমকলের ঢং ঢং আওয়াজ হয়ে বাজছে, কানে তার তালা লেগে গিয়েছে।

বাঁক ঘুরে সে দেখতে পায় এলোমেলো আবোলতাবোল হানাহানির দৃশ্য। লালের আভাস লাগছিল চোখে। ধীরে ধীরে সে চোখ তোলে। তার বাড়িটা পুড়ছে এ দিকে! তার বুড়ি মা আর বৌ ছেলেমেয়েরাও পুড়ছে কি না কে জানে!

কয়েকদিন পড়ে বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় কারখানার গেটের সামনে। গেট তখনো খোলেনি, যদিও অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে খোলার।

বিড়ি দে। খপর বল।

খানিক তফাতে মোড়ের বটগাছটার নিচে বেঞ্চে তক্তপোশে শোয়া-বসা সৈন্য আর এলোমেলোভাবে জমা করা রাইফেলগুলির দিকে চোখ রেখে দু'জনে তারা খবর বলাবলি করে।

দেখলি তো? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।

না তো কি? কে মরবে তবে?

ওনারা সব ঠিক আছেন বাহাল তবিয়তে।

তা রইবেন না? বাহাল তবিয়তে রইবার জন্যে তো এত কাণ্ড। বৌটা পুড়ে মরেনি। পাত্তা পাইনি কিনা আগুন লাগার দিন থেকে, তাই ভাবছিলাম পুড়েই মরেছে বুঝি। খোঁজ পেলাম কাল।

সচ্?

হাসপাতালে আছে। বাঁচবে বুঝি।

মাটা মরেছে পুড়ে।

হাঁঃ?

আর সবকটা ঠিক আছে। ভুখে মরছে বটে তা সামলে যাবে মালুম হয়, আজ রেশন মিলবে জরুর। মিলবে না ?

গেট খোলা হয়, ঠিক আধহাত। লোহার চেনে ঢিল দিয়ে একবারে একটা মানুষ ঢুকবার মত ফাঁক রেখে আবার চেনে তালা আঁটা হয়।

শ'তিনেক লোক তখন জমা হয়ে গেছে গেটের সামনে। নাম ডেকে ডেকে একজন একজন করে ঢোকানো হয় ভেতরে। বাদ পড়ে জন চল্লিশেকের নাম। সে আর তার বন্ধুর নামও। গেটের ফাঁকটুকু তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

তাদের কাজ নেই। ভেতরে যাবার অধিকার বা প্রয়োজনও তাদের নেই। হল্লা না করে সরে পড়ুক তারা, হটে যাক। একদিনে এমন বেপরোয়াভাবে প্রায় চল্লিশ জনকে ছেঁটে ফেলা! একমাস আগে তিন জনকে ছাঁটাই করার বাহাদুরি যারা হজম করতে পারেনি, বাধ্য হয়েছিল আবার সে তিনজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে, তাদের এত সাহস! মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সকলে, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সে আর তার বন্ধু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দুকধারী পুলিস আসে, ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তাদের বোঝাই করা হয় পুলিসের লরীতে।

লরী চলতে আরম্ভ করলে হাত বাড়িয়ে সে বন্ধুর ছেঁড়া শার্টের কলার চেপে ধরে। থু-থু ক'রে রাস্তায় ফেলে দেয় মুখের বিড়িটা।

—আজ শালা তোকে খুন করব।

বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।—কর।

—বল শালা তোর কোন জাত নেই, আমার কোন জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।

বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।—ঠিক।

ছাঁটাই রহস্য

গিধর অ্যাণ্ড বাঙনা কোম্পানীর এই অপিসটা, রণধীর যেখানে কবছর কাজ করছে পঁচাত্তরে ঢুকে আশীতে উন্নত হয়ে, সেটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পঞ্চাশ ষাটজনের আপিসটাতে লড়ায়ের সময় একশো'র ওপর নতুন কর্ম্মচারী নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনের চাকরীও অস্থায়ী নয়, সবাই এখানে পারমানেণ্ট। সকলের নিয়োগ পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ যথেষ্ট বিবেচনা না করলে ম্যানেজার তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না। বরখাস্ত করলে একমাসের নোটিশ অথবা বেতন দেওয়া হবে। ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অন্যায় মনে করলে বরখাস্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে লিখিত দরখাস্ত পাঠাতে পারবে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং বিচার ও বিবেচনা করে রায় দেবে।

রণধীর কাজ করছে চার বছরের বেশী। এই সময়ের মধ্যে ম্যানেজার টি, এল, বাঙনা,—আসল বাঙনার সে ভাইপো, বরখাস্ত করেছিল মোট ন'জনকে। প্রথম দুজনের দরখাস্ত হয়েছিল নিষ্ফল, তৃতীয় জন দরখাস্ত করে নি। চতুর্থ জন দরখাস্ত করায় সত্যিই তার চাকরী টিঁকে গিয়েছিল ম্যানেজারের হুকুম নাকচ হয়ে! তাই পরে বরখাস্ত অন্য

সকলেই দরখাস্ত করেছিল, ফলও পেয়েছিল আরেকজন। সে অষ্টম জন।

দু'জনের বেলা হুকুম নাকচ করে দিয়েও কিন্তু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জি, জি, গিধর ম্যানেজার সায়েবের প্রেষ্টিজের ক্ষতি করে নি এতটুকু। কোন লিখিত বা মৌখিক আদেশ আসেনি তার কাছ থেকে ম্যানেজারের হুকুমের বিরুদ্ধে। বাঙনার মারফতেই সব করা হয়েছে। বাঙনা দু'জনকে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়েছে যে তাদের দরখাস্ত পড়ে দয়া হয়েছে গিধরের, গিধর তাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের আরেকটা চান্স দেওয়া যেতে পারে কি না বিবেচনা করতে। সে তাদের তিন মাস টাইম দিচ্ছে। তিন মাস ঠিকমত কাজ করলে, আর কোন দোষ না করলে, সে বিবেচনা করবে তাদের রাখা চলবে কি চলবে না! কয়েকজন রিজাইন দিয়ে চলে গেছে,—কেউ স্থায়ী চাকরীতে, কেউ অস্থায়ী চাকরীতেও। মাইনে বড় কম এখানে। মাগগীভাতাও কম। এ বিষয়ে কোম্পানী দৃঢ় ও স্পষ্টভাষী: কাল লড়াই থেমে গেলেও কোম্পানী যখন একজনকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা রাখে না, কোম্পানী যখন দিচ্ছে চিরদিনের নিরাপত্তা, নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের গ্যারাণ্টি, প্রায় সরকারী চাকরীর (স্থায়ী) মতই যখন নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে কোম্পানীর চাকরী, ঠিক যুদ্ধের সময়টুকুর জন্য যখন লোক নিচ্ছে না কোম্পানী, মাইনে মাগগীভাতা গ্রেড প্রভৃতি ঠিক করা সম্পর্কে পৃথিবীতে লড়াই একটা চলছে কি চলছে না সে প্রশ্ন বাদ দেবার অধিকার নিশ্চয় কোম্পানীর আছে। কোম্পানীর এই পলিসি অবশ্য সরকারী ভাবে কোম্পানী ঘোষণা করে নি। কয়েকজন চাকুরে গল্পগুজব-আলোচনা বিবেচনা-বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কর্ম্মচারী মহলে মাইনে পত্র কম পেয়েও এখানে চাকরী করার পরম সুবিধা ও চরম সৌভাগ্যের কথা

প্রচার করেছে—এতটুকু রিস্ক নেই ফ্যাসাদে পড়বার, যাই ঘটুক পৃথিবীতে। তালা-আঁটা সিন্দুকের নিশ্চিন্ত নির্ভরশীলতা এখানে।

আত্মীয় স্বজনের যুক্তি পরামর্শ উপদেশের প্রতিধ্বনি যেন এসব কথা, তাদের কামনার পরিতৃপ্তি যেন কোম্পানীর এই ভরসা দান—বেকার তুমি কখনো হবে না তোমার নিজের দোষ—গুরুতর, অমার্জ্জনীয় দোষ ছাড়া। তবু চারিদিকে সকলের মধ্যে অসন্তোষ, গুমরাণো গুমরাণো অসন্তোষ, জ্বালা। রণধীর এটা প্রতিদিন টের পেয়ে আসছে চাকরীর প্রথমদিন থেকে, অনুভব করছে। তার নিজের অসন্তোষ এবং জ্বালাও কম নয়। কিন্তু সে ধীর শান্ত ধৈর্য্যশীল, বাপের মতই বিবেচক বলে সংসারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তার প্রশংসা। সে ভাবে যে কেরাণীর জীবনে, চাকুরের জীবনে, দাসের জীবনে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু এ আপিসে নয়, সব আপিসেই এটা অনিবার্য্য। বুদ্ধি দিয়ে হিসাব করে, হতাশা দিয়ে মেনে নিয়ে সে ভাবে যে উপায় কি।

এখানে চাকরী নেবার সময় একটা কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাকে। একশোটাকার আধা-সরকারী অস্থায়ী লড়ায়ের চাকরীটা নেবে, না পঁচাত্তর টাকার এই চাকরীটা নেবে। আত্মীয় স্বজন সবাই ছিল স্থায়ী চাকরীর পক্ষে, বৌ পর্য্যন্ত—একটি তার মেয়ে জন্মেছে তখন, আরেকটি ছেলে অথবা মেয়ে কয়েকমাসের মধ্যে জন্মাবে। কিন্তু এ চাকরী যে স্থায়ী হবে তার স্থিরতা কি, এই নিয়ে খটকা বেধেছিল সকলের মনে।

রণধীরের নিজের মনেও।

দোটানায় পড়ে একটা কিছু ঠিক করে ফেলতেই হবে এ অবস্থা হওয়া যেন চড়া জ্বর হওয়ার মত, ছটফট করতে করতে মরিয়া হয়ে

জীবন সরকারকেই সে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, একটা কথা বলব স্যর আপনাকে। ওয়ার টাইম বলে বাড়তি লোক নিচ্ছেন অনেক, লড়াই থেমে গেলে কাজ না থাকলে এত লোককে রাখা চলবে কি করে ?

জীবন সরকার বরাভয় দেওয়া হাসির সঙ্গে বলেছিল, থাকবে না কে বললে তোমায় ? লড়াই শেষ হলে ব্যবসা বানিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে নাকি ? ওয়ার টাইম বলেই আমরা বরং কোণ ঠাসা হয়ে আছি, বাড়তে পারছি না। লড়াই থামলে কোম্পানী আরও বাড়বে, আরও নতুন লোক নিতে হবে তখন, আমাদের প্ল্যান আছে।

আমরা ! আমাদের ! আড়াইশো টাকা মাইনে দেয় কোম্পানী মাসে মাসে জীবন বাবুকে, তাতেই কোম্পানী নিজস্ব হয়ে গেছে জীবন বাবুর ! থ্যাবড়া মোটা নাকের ওপর ঢালু কপালে চন্দনের ফোঁটার দিক চেয়ে হঠাৎ হাসি পেয়েছিল রণধীরের, হাতটা নিসপিস করে উঠেছিল তাড়াতাড়ি পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর এই নিশ্চিন্ত অমায়িক গোলগাল ভোঁতা মুখখানার স্কেচ করে নিয়ে তলায় লিখতে: চালকুমড়োয় কাকের কীর্ত্তি।

শ্বেত চন্দনের ফোঁটা কাটা এই অমায়িক মুখখানাই খেঁকিয়ে ওঠা পাগলা কুকুরের মুখের মত কি বীভৎস রকম ক্রুর দেখাতে পারে, তার পরিচয় রণধীর পেয়েছিল পরে। অনেক বার।

বেতন কম খাটুনি বেশী, ব্যবহার হরেদরে অন্য আপিসের মতই। জিনিষপত্রের দামে আগুন লাগায় সব আপিসেই কিছু কিছু মাগগী ভাতা দেবার রীতি চালু হয়েছে, এখানেও বারাদ্দ হয়েছে যৎ সামান্য। আর সেই জন্যই বোধ হয় গ্রেড জিনিষটার হয়েছে পক্ষাঘাত, মাইনে আর

বাড়ে না কারো, বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। বছরে পাঁচ টাকা বাড়ার কথা রণধীরের, তিন বছর লেগেছে একটা পাঁচটাকা বাড়তে—তাও জীবন বাবুর বিশেষ দয়ায়! পাড়ায় থাকে, চেনা শোনা আছে আগে থেকে, রণধীরকে একটু স্নেহ তার করা উচিত, এইজন্য।

মুস্কিল কি জানো? গ্রেড তো অটোমেটিক নয়, ওই যে ক্লজটা আছে কাজের মেরিট সম্বন্ধে, ওটাই আসল। রাখাল আর ভুবন দুটো ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে গেল এরি মধ্যে দশটাকা আর পঁচিশটাকার—ওদের কাছে কোম্পানী উপকার পেয়েছে বলেই তো।

মুখ গম্ভীর করে জীবন একটু চিন্তা করেছিল।

আচ্ছা তোমার একটা করে দিচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করো, কোম্পানীর ইনটারেষ্ট নিজের ইনটারেষ্ট ভাবতে শেখো, গ্রেড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কোম্পানী নিজে থেকে যেচে গ্রেডের দশগুণ ইনক্রিমেণ্ট দেবে।

বাদামী দেয়াল চোখে নোনা, কর্কশ লাগে। ছোট একটি সংসার আর এই আপিসের সংক্ষিপ্ত জগৎটুকুতে জীবনের রীতিনীতির মধ্যে সামান্য সামঞ্জস্য খুঁজে বার করবার চেষ্টায় এই বয়সেই একেবারে শেষ বারের মত হার মানতে সাধ যায় রণধীরের, নিস্পৃহ বৈরাগ্যে সব একাকার হয়ে চুলোয় যাক। জীবনটা নিংড়ে দিচ্ছে সংসারকে, সংসার তবু খুসী নয়। খেটে রক্ত জল করছে, আপিস তবু খুসী নয়। হঠাৎ দুশো টাকার একটা চাকরী নিয়ে ভাইটা কোথায় চলে গিয়েছিল, দু'বছরে সে সংসারে সাহায্য পাঠিয়েছে তিন কিস্তিতে দেড়শো টাকা আর লিখেছে লম্বা লম্বা কথাভরা চিঠি। কারো পরামর্শ জিজ্ঞেস না করে চাকরী নিয়ে উধাও হওয়ার জন্য তার ওপরে চটে আছে সকলেই, কিন্তু সেই যেন

গর্ব্ব আর গৌরব সংসারের—ও কিছু করবে জীবনে। রাখাল ও ভুবনের ফাঁকির সাগরে কাজের ডিঙি ভাসে না; ম্যানেজারের পা চেটে, জীবনের খোসামোদ করে আর কোম্পানীর গুণ কীর্ত্তন করেই সময় কাটে, কোম্পানী বড় খুসী ওদের ওপর, ওরা কাজের লোক।

কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে দরকারি ফাইলের মলাটে বাঁদর গড়ে ওঠে একটা, ভেংচি দিয়ে হাসছে। খানিক চেয়ে থেকে আরও কয়েকটা আঁচড়ে হাসিটা কান্নায় পরিণত করে রণধীর, একটু কালী লেপে দেয় বাঁদরটার ওপর।

ফাঁদে পড়ার মনোভাব প্রায় সকলেরি—আশঙ্কা, আপশোষ, নিরুপায় হতাশা। গোড়ার দিকে এই ছিল সব, তারপর কিভাবে যেন ধীরে ধীরে জেগেছে ঘৃণাবোধ, উগ্র তীব্র ঘৃণাবোধ, আর—রণধীর ঠিক জানে না—বিদ্বেষের জ্বালা অথবা রাগ। তার নিজের মধ্যেও জেগেছে। ভালরকম সে বোঝে না হৃদয় মনে এই ঘৃণা ও জ্বালা অথবা রাগের সৃষ্টি কাহিনী, একটু শুধু অনুমান করে যে চারিদিকে লড়ায়ের বিপর্য্যয় যে ধাক্কা মেরে চলেছে ক্রমাগত, ওটা তারই প্রতিক্রিয়া। সঙ্কীর্ণ জীবনের সীমাবদ্ধ শান্ত ম্রিয়মাণ জগৎটুকুতে এসে পড়েছে উদ্দাম তাণ্ডব, জগতের যা কিছুর সঙ্গে হৃদয়মনের সংযোগ তাতেই ঘটছে নিয়মাতীত বে-হিসাবী অবিশ্বাস্য ওলোট পালোট, ধারণা বিশ্বাস সংস্কারের তো কথাই নেই, স্বপ্ন পর্য্যন্ত রেহাই পায় নি। অলস কল্পনা আজও আকাশে ফুলের চাষ করছে; রঙীন আকাশ কিন্তু হয়ে গেছে কালো, ফুলগুলি তাতে ঝিলিক মারছে তারার মত, আগুনের ফুলকির মত।

কি যে এক অস্থিরতা এসেছে ভেতরে, আগেকার কোন ব্যাকুলতার সঙ্গে তার মিল নেই। অন্যের মধ্যেও এই অস্থিরতার অস্তিত্ব এত সহজে

সে টের পায়। তারই মত সকলে যেন একটা খাপছাড়া কাজ করতে চায়, হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে চায় যা কিছু আছে চারিদিকে, প্রিয় বা অপ্রিয়। জীবনের সঙ্গে জড়ানো সব কিছুর প্রতি যে অদম্য মমতা, এই আপিসের তালা চাবি আঁটা সিন্দুকের নিরাপত্তায় অন্ধ বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত হবার কামনা থেকে বাঙনা-জীবনদের কাছে মাথা নিচু করে সবরকমে আত্মসমর্পণ করার তৃপ্তিকর বাসনার প্রতি পর্য্যন্ত, সেই মমতাকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলে থেঁতলে আথালি পাথালি নাচতে চায়। আগে প্রাণ ব্যাকুল হত রণধীরের, মুড়ানো বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের ব্যথা বেদনা দুঃখ লজ্জা পরাজয় অপমান পিছনে ফেলে পালিয়ে যেতে আছাড়ি পিছাড়ি করত প্রাণটা, কাঁটার ব্যথায় দিশেহারা গরু ছাগলের মত। আজ বাঘের মত হুমড়ি দিয়ে পড়ে নখে দাঁতে কাটা গাছটাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য ছটফটানি।

রোগা দুর্ব্বল নিরীহ নকুল পর্য্যন্ত বলে, দুত্তেরি আর ভাল লাগে না। ঘরে একটা আর এই আপিসে একটা বোমা পড়ত, বাস চুকে যেত সব। তা শালার জাপানী ব্যাটারা এগোতেই পারল না।

গোকুল ফিরে আসে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে। মিনিট খানেক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ তাকে ডেকে বলে, শোন্। এই গালটা বাঙনার।

আঙ্গুল দিয়ে নিজের ডান গালটা দেখিয়ে জোরে ঠাস করে এক চড় মারে গালে।

এই গালটা জীবন-শালার।

বাঁ গালে চড়টা মারে আরও জোরে।

গোকুলকে বাঙনা বরখাস্ত করেছে। গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে

বারণ করেছে জীবন। গোকুল তবু চাপাচাপি করাতে তার হাত থেকে দরখাস্তটি নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে জীবন, চোখ লাল করে বলেছে, গোলমাল করলে একমাসের মাইনে পর্য্যন্ত পাবে না, এইদণ্ডে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো।

বিড় বিড় করে বকে যায় গোকুল। নিজের মারা চড়ে তুটি গাল তার লাল হয়ে উঠেছে।

গিধর বাঞ্চোতের গালে তো চড় মারা হলনা? ব্যাটা বেঁচে গেল। গোকুলের হাতের এক চড় খেলে নির্ঘাৎ—বহুত আচ্ছা, লাথি মারব ব্যাটাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে সে প্রাণপণে লাথি মারে।

গোকুলের পর রঞ্জিত। তাকেও জীবন বারণ করেছিল গিধরের কাছে দরখাস্ত দিতে, তবে জোর জবরদস্তি করে নি। রঞ্জিত বারণ না মানায় দরখাস্ত নিয়ে জীবন বলেছিল, বেশ পাঠিয়ে দেব।

তারপর তিলকের পালা। তার দরখাস্তও নেওয়া হল। একদিন তুদিন পরে পরেই বরখাস্তের নোটিশ পড়তে লাগল এক একজনের ওপর আকাশের বজ্র পড়ার মত, রাস্তায় মিলিটারী লরী ঘাড়ে পড়ার মত। এক মাসে সতরজন বরখাস্তের হুকুম পেল। প্রত্যেকে তারা অকর্ম্মণ্য, তাছাড়া নানা দোষে দোষী।

তারক বড় বেশী কামাই করে।

তারক তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল, গত চারমাস ধরে প্রতিমাসে তার পাঁচ ছ'দিন করে কামাই।

তারক বলল, স্যর, ঠিক টাইমে এসেও খাতা পাইনি সই করতে। আপনি বললেন কোথায় যেন আছে খাতাটা, আপনি মার্ক করে নেবেন আমি প্রেজেণ্ট। ক্রশমার্কের বদলে ছুটো লাইন টেনে মার্ক দিয়েছেন আমি প্রেজেণ্ট বলে—

জীবন বলল গর্জ্জে, দুলাইন মার্ক কামাই-এর মার্ক, যারা কামাই করে খবর পাঠায় তাদের মার্ক ক্রশ, যারা কামাই করে খবর দেয় না তাদের মার্ক ছুটো লাইন। তুমি আমায় শেখাবে?

অবনী লেট করে।

অবনীতো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল বছরখানেক ধরে প্রতিমাসে সে গড় পড়তা দশ বার দিন লেট!

অবনী বলল, স্যর, আপনি তো বলেছিলেন সই করতে হবে না, ঠিক টাইমের বিশ মিনিট আগে যারা আসে তাদের ভি মার্ক দিয়ে রাখেন ভেরি গুড বলে, তাদের একটা প্রাইজ দেওয়া হবে।

জীবন গর্জ্জে বলল, যারা এক ঘণ্টার বেশী লেট করে এল-এর বদলে তাদের ভি মার্ক—ভেরি লেট। শেখাতে এসেছো?

অনিল আপিসে রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য চালিয়ে আপিসের কাজে ব্যাঘাত জন্মায়!

অনিল তো অবাক। গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। তিনখানা অভিযোগ পত্র তার সামনে ফেলে দেওয়া হল। রাখাল, ভুবন, আর শৈলেন নালিশ জানিয়েছে যে অনিল তাদের কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বার হবার জন্য সর্ব্বক্ষণ জ্বালাতন করে, কাজ কর্ম্ম করতে দেয় না।

অনিল বলল, আমিতো পলিটিকস্ করি না, কোন দলে নেই!

জীবন গর্জ্জে বলল, 'ওসব ন্যাকামি জানি আমি। এমনি সাধু

সেজে ন্যাকামি করে তোমরা কাজ চালাও। আমায় শেখাতে এসেছো ?

নারায়ণ পেন্সিল নিব আলপিন প্যাড চুরি করে।

নারায়ণ তো অবাক! গিয়ে প্রতিবাদ জানাল। খাতা খুলে দেখানো হল গত মাসে সে সাতটা পেন্‌সিল দশ ডজন আল্‌পিন চারটে প্যাড নিয়েছে। একজন কেরাণীর কখনো অ্যাত পেন্সিল নিব আল-প্যাড লাগতে পারে একমাসে ?

নারায়ণ বলল, আপনি তো বললেন আমার সেকসানে পেন্‌সিল টেন্‌সিল নিব্‌ এসব আমি বিলি করব। আমি নিজের নামে নিয়ে গিয়ে যার যেমন দরকার দিয়েছি। মুখে মুখে হিসাব দিচ্ছি শুনুন। রাখাল বাবু দুটো পেন্সিল তিন ডজন আলপিন নিয়েছে, ভুবন বাবু দুটো পেন্সিল দু ডজন আলপিন দুটো প্যাড—

জীবন গর্জ্জে বলল, রসিদ দাও।

রসিদ? খিল খিল করে হেসে উঠেছিল নারায়ণ, তার অল্প বয়সে সামনের একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় ফাঁকে হুইস্‌লের শব্দ তুলে, রসিদ কি বলছেন স্যর? কে একটা আলপিন চায়, নিব চায় আপিসের কাজে সেজন্য রসিদ নিয়ে দিতে হবে? আগে জানলে আমি তো ভার নিতাম না আমার সেকসানে এসব বিলি করার।

জীবন গর্জ্জে বলল, চোরেরা এরকম কৈফিয়ৎ দেয়। আমায় শেখাতে এসেছো ?

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেঁটে রোগা হাসিখুসী রহস্যপ্রবণ নারায়ণ। অন্যেরা চলে যেত, সে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা অনেক কথা বলত, রাগত, কাঁদত নারায়ণ একপলকে বিদ্যুদগর্ভ ধাতুর মত কঠিন হয়ে গেল।

আমি চোর?

তা ঠিক বলিনি, তবে কথাটা কি জানো নারায়ণ—

নারায়ণের চড়ে গাল ফাটল না বটে জীবনের, কিন্তু বাঁধানো দাঁতে গাল কেটে গিয়ে রক্ত বেরোল মুখ দিয়ে থুতু আর শ্লেষ্মার সঙ্গে। বাঁ হাতে মুঠো করে তখনো নারায়ণ ধরে আছে জীবনের মাথার চুলগুলি। চুল তার কম, তবে বড় বড়। টাক ঢাকতে জীবন বড় চুল রাখে এবং উল্টো করে আঁচড়ায়।

আমি চোর? বলে গর্জ্জন করে নারায়ণ চড় মারা হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে ঘুষি মারতে যাচ্ছে, রাখাল ভুবন শৈলেন এবং আরও কয়েকজন তার হাত এবং তাকে ধরে ফেলল। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এসে নারায়ণকে নিয়ে গেল হাজতে।

পরদিন থেকে বরখাস্তদের সামনাসামনি প্রতিবাদ জানানো বারণ হয়ে গেল। যা কিছু বলার অছে তা তারা লিখে জানাবে। মানুষিক দুর্ব্বলতার দরুণ এমন একটা অঘটন ঘটে যাওয়ায় কর্ত্তারা বোধ হয় অনুতপ্ত হয়েই অমানুষিক সরলতার সঙ্গে হুকুম জারি করল যে ম্যানেজারের বরখাস্তের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে বিচার প্রার্থনার দরখাস্ত পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিশেষ ভাবেই সচেতন যে এই দুঃসময়ে একজনের চাকরী যাওয়াটাই কি শোচনীয় ব্যাপার, অতএব তিনি স্থির করেছেন যে বরখাস্তের নোটিশ জারি হবার আগেই তিনি প্রত্যেকটি নোটিশ নিজে স্বাক্ষর করবেন—বরখাস্ত না করে চলে কিনা, আরেকটা চান্স দেওয়া যায় কিনা, ম্যানেজারের অন্যায় হয়েছে কিনা, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এসব বিবেচনা করার পর।

বাড়ী গিয়ে চা পর্য্যন্ত না খেয়ে মাদুরে চিৎ হয়ে, রণধীর বলল তার স্ত্রীকে, তার মানে গিধরের সই করা বরখাস্ত নোটিশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা চলবে না।

ওগো, তুমি বরখাস্ত হয়েছে নাকি? বলে কেঁদে উঠল সরলা। মেয়েটা আগে থেকে কাঁদছিল, একবছরের মেয়ে আর তার মায়ের কান্না একই সুরে বাজতে লাগল রণধীরের কাণে। রণধীরের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল, আনন্দে সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। আজকে সকালেই বাজারে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখা হওয়ায় ডাঁটা, ঝিঙা, চিচিঙা, বেগুন কেনার ফাঁকে ফাঁকে ললিত তাকে শোনাচ্ছিল— বেদের ওংকার কি ভাবে এ যুগে কারখানায় ভোঁ-কার হয়ে গেছে। মেয়ের খিদের কান্না আর তার মায়ের ভয়ের কান্না একাকার হয়ে সেই কথাটাই যেন প্রমাণ করে দিল রণধীরের কাছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর মাস দুই কাটতে একমাসে সতরজন বরখাস্ত! শঙ্কার কালো ছায়া নেমে আসে সকলের মুখে। বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। আপিস বসবার আগে, টিফিনের সময় ও ছুটির পর পাঁচসাতজনে একত্র হয়ে ছোট ছোট ভাগে আলোচনা চালায়, চাপা গুঞ্জনে আপিসটা যেন গমগম করে। সর্ব্বদা হাসি গল্পে মসগুল ফুর্ত্তিবাজ রাখাল ও ভুবন কেমন যেন দমে গেছে, সেই নির্ভয় নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভাব আর নেই। কয়েকজন মিলে যেখানে কথা বলছে তার ধারে কাছে তাদের কেউ একজন এলেই সবাই এমন ভাবে চুপ হয়ে যায় যে তাকে দু'বার ঢোক গিলতে হয়, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে ঢং করে বলতে হয়, দেশলাইটা

কেউ ছাড়ুন না সার ! এইভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে সিগারেটটা ধরিয়েই সরে পড়তে হয়। আগে হলে সবাইকে সিগারেট দিত, এখন ভরসা পায় না।

রবিবার সকালে রণধীর যায় জীবনের বাড়ী। সবিনয়ে প্রশ্ন করে, ছাঁটাই সুরু হল নাকি স্যর ?

তুমি বড় বেয়াদব রণধীর, গভীর আপশোষের সঙ্গে জীবন বলে, বড় বোকা তুমি। তোমাকে চাকরী দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল আমার। ছাঁটাই কিসের ? কয়েকটা অকেজো ফাঁকিবাজ বাজে লোককে বিদায় করা হচ্ছে। নতুন লোক নেওয়া হবে ওদের যায়গায়। তাছাড়া—ভ্রূকুটিতে কুটিল রেখায় ছেয়ে যায় জীবনের গোলগাল মুখ, —সব বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকারটা কি ? কাজ করছ, কাজ করে যাও। আমি তো আছি। কাকে রাখি, কাকে তাড়াই, কাকে আনি, তোমার তাতে কি এলো গেলো ? তোমার চাকরী থাকলেই তো হ'ল ?

জীবনের মুখের মেঘ অদৃশ্য হয়ে যায় হঠাৎ।

—বোসো। ওরে, কে আছিস, এক কাপ চা দিয়ে যা বাইরে।

চা খেয়ে এসেছিলাম, স্যর।

বার্ণিশ করা চকচকে চেয়ারে বসে রণধীর বলে। জীবন সে কথার জবাব দেয় না, যেন শুনতেই পায় নি। আপন খেয়ালে দার্শনিকের মত কতগুলি মূল্যবান কথা শুনিয়ে যায় রণধীরকে,—'সংসারটা, কি জানো রণধীর, বড় কঠিন ঠাঁই। অনেক বিবেচনা করে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষকে টিকে থাকতে হয় সংসারে। আত্মরক্ষাই ধর্ম্মো মানুষের—শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই ধর্ম্মো। যে নিজেকে বাঁচতে পারে সেই বাঁচে, নইলে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া আর পথ নেই, উপায়

নেই। এই যে দুর্ভিক্ষটা গ্যালো, লাখ লাখ লোক মরল, তুমি আমি বাঁচলাম কি করে? আমরা যে ভাবে হোক খাদ্য যোগাতে পেরেছি, বেঁচেছি। ওরা পারে নি, মরেছে।

চাকর চা এনে দিলে বলে, খাও। আপিসে নাকি গণ্ডগোল পাকাচ্ছে? কি বলছে সবাই বলতো শুনি?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

ক'জন নাকি দল বাঁধবার চেষ্টা করছে হাঙ্গামা করার জন্য? সতীশ আর নিবারণ সবাইকে উস্ক ' ", না?

গরম চা-এ বিষম লাগে রণধীরের। কাপ থেকে চা উছলে পড়ে তার জামা কাপড়ে। কাপ রেখে নিজেকে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে সে আশ্চর্য্য রকম শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি তো জানিনা।

—জাননা? ও!

পরদিন সোমবার। একটু সকাল সকাল আপিসে যায় রণধীর। অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার একটা চেষ্টা চলছে আপিসে সে জানে। কিন্তু বিশেষ তার শ্রদ্ধা ছিল না এ প্রচেষ্টায়। কেরাণী জীবদের সে চেনে। আগে থেকেই আঁটঘাট বেঁধেই কর্ত্তারা উচ্ছেদ সুরু করেছে। সতর জন শুধু ওয়ার টাইমে নেওয়া নতুন লোক নয়, ওদের মধ্যে তিনজন আছে পুরানো, একজন কাজ করছে তের বছরের ওপর। বেছে বেছে অকেজো অপদার্থ কয়েকজনকে তাড়িয়ে বাকী সকলকে রাখা হবে—অপিস তো থাকবে, লোক তো লাগবে অপিস থাকলে: এই রকম একটা জোরালো প্রচারও চলছে তলে তলে। অনেকে নিশ্চয় ভাবছে, অন্যের বেলা যাই হোক, আমি হয় তো টিকে যাব। প্রতিবাদের একটু আগুন জ্বালাতে পারলেও

তা মিন মিন করে জ্বলবে সমর্থনের অভাবে, গিধর, বাঙনা, জীবনেরা অনায়াসে ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু কাল জীবনের সঙ্গে কথা বলে একটু খটকা লেগেছে তার মনে। এত আঁটঘাট বেঁধে ছাঁটাই সুরু করেও তো তেমন নিশ্চিন্ত নয় জীবন, কেরাণীদের গোলমাল বাধবার চেষ্টাকে মোটেই সে তুচ্ছ করে দিতে পারছে না। জীবন কেরাণীদের কথা এত জানে, অথচ সে নিজে কেরাণী হয়ে জানে না অবস্থা ঠিক কি দাঁড়িয়েছে। কিছু হবে না ভেবেই উদাসীন থেকেছে, এড়িয়ে চলেছে সকলের বার্ত্তা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি রণধীরের। আগ্রহ উত্তেজনা কৌতূহলের চাপে ছটফট করেছে।

অবিনাশ ছাড়া কেউ তখন আপিসে আসে নি। অবিনাশ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না। তার মস্তিষ্ক একটু শ্লথ। ঘণ্টাখানেক আগে না এলে কাজ সেরে আপিস থেকে বেরোতে সন্ধ্যা উৎরে যায়। ভাল করে কাজ না করার সাহসও তার নেই।

অবিনাশ বলে ধীরে ধীরে, তাই ভাবছি দাদা। হ্যাঁ, প্রোটেষ্ট একটা করা উচিৎ। ওদের রাখা হোক সবাই মিলে এ অনুরোধটাও জানানো চলে। কিন্তু ওদের রাখতেই হবে, ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, নইলে সবাই ষ্ট্রাইক করব, এটা উচিৎ মনে হয় না। ছাঁটাই তো চলছে না স্পষ্টই বলেছে সেকথা। অনেক লোক নিয়েছে, বাজে লোক ঢুকেছে কয়েকটা তার মধ্যে, তাদের যদি রিপ্লেস করতে চায়—

একটু দমে যায় রণধীর। তবে অবিনাশ লোকটাই আধমরার মত শ্লথ, নির্জীব। সকলে ওর মত নয়।

একে দুয়ে অন্যেরা আসতে থাকে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা কয় রণধীর। অবিনাশের মত কথা কয় দু'একজন, কিন্তু সকলে

অতটা নরম নয়। নিশ্চয় জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কেস আবার বিবেচনা করা হোক, যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের বহাল রাখা হোক, এ দাবীও জানাতে হবে। তবে দাবী না মানলে তারা ষ্ট্রাইক করবে, এ ভয় দেখানো সঙ্গত হবে না। সে রকম অবস্থা দাঁড়ায় নি। কয়েকজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে, বড় জোর আর দু'চারজনকে করবে—তাও করবে কিনা ঠিক নেই। কর্তৃপক্ষ তো স্পষ্টই জানিয়েছে যে এ আপিসে ছাঁটাই চালাবার প্রশ্নই ওঠে না। আবার খুব গরম হয়েও আছে কয়েকজন। তাদের কথা স্পষ্ট—শুধু প্রতিবাদ আর দাবী জানিয়ে হবে কচু।

আপিসের কাজ আরম্ভ হবার পরেও রণধীর বার বার এর টেবিল ওর টেবিলে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে আসে। এই সতরটা বরখাস্তের মানে যে অনেকে ধরতে পারে নি একথা ভেবে তার অদ্ভুত এক বিস্ময় জাগে, লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গুম খেয়ে খানিকক্ষণ নিজের যায়গায় বসে থাকার পর ধীরে ধীরে লজ্জা ও আপশোষ কেটে গিয়ে বিস্ময় বোধটাই বড় হয়ে ওঠে তার মধ্যে। আর কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে বলে তার মনে হয় না। সকলের মন যেন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস ধোঁয়াচ্ছে সবার মনে, কিন্তু এখনো ওরা বিশ্বাস আঁকড়ে আছে মানুষের ওপর, মানুষের কথায়—গিধর, খাওনা, জীবনকে ঘৃণা করেও পুরোপুরি প্রত্যয় জন্মাতে পারছে না, ওরা একেবারেই অমানুষ, এতটুকু দাম নেই ওদের কথার, ওরা রক্তচোষা রাক্ষস!

সাড়ে এগারটার সময় পিয়ন এসে রণধীরকে দিয়ে যায় তার

বরখাস্তের নোটিশ। রণধীর আশ্চর্য্য হয় না। নোটিশের আপিসী ভাষার মধ্যে সে জীবনের ঘরোয়া ভাষার ডাক শুনতে পায়: আমার কাছে এসে, ক্ষমা চাও, অনুগত হও, আমি থাকতে তোমার ভাবনা কি, নোটিশ আমি বাতিল করিয়ে দেব। আরেকটা কথা স্পষ্ট হয় রণধীরের কাছে এই নোটিশ পেয়ে। যারা তেজী গোঁয়ার মানুষ, হঠাং বরখাস্ত করলে যারা চুপচাপ তা মেনে না নিয়ে হৈ চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে মরিয়া হয়ে, তাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কিছু করতে সাহস পায় না। সত্তরজন নিরীহ মানুষকে ছাঁটাই-এর কবলে ফেলা হয়েছে অনায়াসে, তাকেও নির্ভয়ে নোটিশ দিয়েছে, কিন্তু সতীশ আর নিবারণকে অবিলম্বে দূর করা জরুরী হয়ে পড়লেও হঠাৎ ওদের নোটিশ দিতে ভরসা পাচ্ছে না কর্তারা, ওদের তাড়াতে হলে বিশেষ বিবেচনা, বিশেষ আয়োজন দরকার।

মনের মধ্যে পুড়তে থাকে। তাকে তবে এমন ভীরু কাপুরুষ, গোবেচারা মনে করে জীবন—জীবনের চোখে মানুষ হিসাবে তার মূল্য এই! কাকের কীর্ত্তি আঁকা একটা চালকুমড়ো—

একটা সিগারেট ধরিয়ে রণধীর স্থির দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে থাকে পার্টিশনের কাঠটার দিকে। দু'চোখ তার জ্বল জ্বল করে। পার্টিশন থেকে তার চোখ উঠে যায় ওপাশের দেয়ালে। মনের মধ্যে একে একে চলে যেতে থাকে আপিসের ভিন্ন ভিন্ন দেয়ালগুলি।

তারপর সে রঙের টিন আর তুলি হাতে নিয়ে গিয়ে ঢোকে আপিসের একপ্রান্তে কর্ম্মচারীদেরই স্বকীয় পায়খানাদি ও জলের কলের ঘরটিতে। দরজার পর সরু প্যাসেজ, ডাইনে তিনটি খোপ, প্যাসেজের শেষে ট্যাপ, বাঁয়ে শুধু চুণকাম করা সাদা দেয়াল। বিবর্ণ হয়ে গেছে দেয়ালটা, তবু তাই ভালো। নোংরা দুর্গন্ধ এখানটা—কিন্তু এখানে কেউ তার

কাজ ঠেকাতে পারবে না, দরজাটা বন্ধ করে দিলে নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারবে।

বাধা কিন্তু পড়ে রণধীরের কাজে। কিছুক্ষণ পরে পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ে, ডাক আসে : দরজা কে বন্ধ করেছে? দরজা খুলুন! রণধীর সাড়া দেয় না, তাড়াতাড়ি দেয়ালে তুলি চালিয়ে যায়।

টিফিনের ঘণ্টা কাবার হতে মিনিট পনের বাকি আছে, দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে জোরে জোরে ধাক্কা পড়েছিল দরজায়। বেরিয়ে এসে সে দেখতে পায় জনপাঁচেক সহকর্ম্মী ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অবিনাশও আছে।

এ দরজাটা বন্ধ করবার মানে?

ভেতরে গিয়ে দেখুন।

তাড়াতাড়ি সে সরে যায়। আপিস থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে চা খেয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খানিক মানুষ ও গাড়ীঘোড়ার চলাচল দেখে টিফিনের ঘণ্টার পর প্রায় আধঘণ্টা দেরী করে ফিরে আসে। মনটা তার অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে ভরে গেছে। আপিসে তার ঢুকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

নতুন একটা উত্তেজনা ও সাড়া যে পড়ে গেছে চারিদিকে আপিসে পা দিয়েই সে তা টের পায়। একজন উত্তেজিত ভাবে কি বলছে আরেক-জনকে, যে শুনেছে তার মুখে ফুটছে বিস্ময়, তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে কর্ম্মচারীদের স্বকীয় পায়খানাদির ঘরের দিকে।

নিজের যাগায় চুপ করে বসে থাকে রণধীর। অবিনাশ ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়। শ্লথ নির্জ্জীব মানুষটি বেশ খানিকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

—যা এঁকেছো তা কি সত্যি ভাই ? ঠিক জানো তুমি ?

জানি বৈকি।

অবিনাশের পর আরও অনেকে আসে। কেউ হেসে তার পিঠ চাপড়ে দেয়, কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলে, চমৎকার এঁকেছো, কেউ বলে, বেশ করেছো ভাই। অনেকেই তাকে প্রশ্ন করে। সে প্রশ্ন প্রায় অবিনাশের জিজ্ঞাসার মতই।

ছুটির পর দু'চারজন ছাড়া কেউ বেরিয়ে যায় না। প্রথমে একত্র হয় আটদশজন, তারপর কেউ না ডাকলেও সেই ছোট দলটির চারিপাশে সকলে এসে জমা হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অবিলম্বে বরখাস্তের নামে ছাঁটাই বন্ধ করার ও যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদের বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবী এবং এই দাবী না মানা পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মচারী কাজ করবে না এই ঘোষণার নীচে প্রায় সকলেই স্বাক্ষর করে বাড়ী যাবার আগে।

ভুবন আসল খবর জানায় জীবনকে। জীবন ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। হাঁ করে সে তাকিয়ে থাকে দেয়ালের পাশাপাশি দু'টি মস্ত ছবি ও লেখাগুলির দিকে। বাঁয়ের ছবির উপরে বড় বড় হরপে লেখা "১৯৪০ সাল—পরামর্শ।" ছবিতে ভুঁড়ির মত গিধর ও বাঙনা এবং কাকের কীর্ত্তির ছাপ মারা চালকুমড়োর মত জীবনকে স্পষ্ট চেনা যায়। তাদের পিছনে বোর্ডে লেখা : "পারমানেণ্ট চাকরী—চলা আও।"

ছোট হরফে নীচে লেখা : গিধর বলছে—পারমানেণ্ট বলে লোক নিলে কত সুবিধা। গড়পড়তা বিশ রুপেয়া কম দিতে হলে লোক পিছু বছরে দুশো চল্লিশ রুপেয়া মুনাফা।

বাঙনা বলছে—তারপর বরখাস্ত করলেই হল।

জীবন বলছে—ঠিক কথা হুজুর !

পাশের ছবির উপরে লেখা "১৯৪৫—শেষ ভাগ'।" ছবিতে একই তিনজন—মুখের বীভৎস হাসি শুধু বীভৎসতর হয়েছে। দেহের তুলনায় হাতগুলি প্রকাণ্ড—সেই হাতে সাপটে তুলে ছোট ছোট অনেকগুলি মানুষকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ডাষ্টবিনে। কয়েকটা মানুষ পড়েছে ডাষ্টবিনে, হাতের মুঠোয় কয়েকজন লড়বড় করে ঝুলছে—লেখা আছে : পারমানেণ্ট কর্ম্মচারী।

আর ডাষ্টবিনের গায়ে লেখা : বরখাস্ত।

জীবনের চোখ কপালে উঠে যায়। তখন তার চোখে পড়ে যে সব কিছুর ওপরে আরেকটা লেখা আছে মোটা হরফে : ছাঁটাই রহস্য।

চক্রান্ত

একমাস আগে পরে দুজনে চাকরি পেয়েছিল। প্রতিমা পেয়েছিল আগে দেড়শো টাকায়। মহেশ মাসখানেক পরে শুরু করেছিল একশো টাকায়। তারপর অবশ্য মহেশ তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিমাকে। যুদ্ধের অস্থায়ী চাকরি বলেই বোধ হয়। প্রতিমার চাকরিটা স্থায়ী হওয়ায় সে দেড়শো টাকাতেই ঠেকে গিয়েছিল কয়েক বছরের জন্য। চাকরি করে একদিন বাড়ীর সকলকে মোটরে চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াবে বলেই মহেশকে পরীক্ষাগুলি পাশ করানো হয়েছিল। প্রতিমার কাছে অবশ্য ওরকম প্রত্যাশা কেউ করেনি। তাকে পরীক্ষা পাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কম খরচে ভাল জামাই জোটাবার ভরসায়। পড়াবার ঋণ যে এদিক দিয়ে এভাবে শোধ করবে সে বাড়ীর কেউ ভাবতেও পারে নি।

মা বলেছিলেন মাথা চাপড়ে, চাকরি করবে? খেঁদি চাকরি করবে? ও মধুসূদন! ওগো মাগো! হায় গো ভগবান!

বাপ বলেছিলেন ধমক দিয়ে, চুপ কর তুমি। দেড়শো টাকা মাইনে —করবে না চাকরি? কত মেয়ে আজ কাল চাকরি করছে, ওতে দোষ নেই।

তারপর বলেছিলেন ঝাঁঝের সঙ্গে, ছেলে! ছেলে তো রাজা করল

তোমায়, বুড়ো বাপের পয়সায় সিগরেট টানছে, লজ্জা নেই! অমন ছেলের চেয়ে মেয়ে ভালো। ভগবান যদি রাখুকে নিয়ে খেঁদির মত আরেকটা মেয়ে স্তান—

এভাবে কথাটা বলা অন্যায় হয়েছিল দীনেশের, ছেলের মৃত্যু কামনা করার মতই শুনিয়েছিল কথাটা। রাখালকে টেনে নিয়ে তার বদলে ভগবান প্রতিমার মত আরেকটা দেড়শো টাকার চাকুরে মেয়েকে ধপ করে আকাশ থেকে ফেলে দেবেন, প্রার্থনাটা এতখানি খাপছাড়া হওয়া সত্ত্বেও।

প্রতিমাও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, এটা তোমার অন্যায় বাবা। দাদা চাকরি করবে না বলেই তো, নইলে একশো দেড়শোর চাকরি দাদা খুশী হলেই নিতে পারে। আমি যদি মিষ্টার ঘোষকে বলি, শ'খানেক টাকার পোষ্ট একটা নিশ্চয় দাদা পেয়ে যাবে।

রাখাল ঘরের ভেতরে ছিল না। বাড়ীর কয়েকজনের যেখানে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা চলে, রাখাল সেখানে কখনো থাকে না। ' সে তো জানে কি আলোচনা সবাই করে থাকে। পৃথিবী জুড়ে এমন একটা হানাহানি চলছে ভয়াবহ, এলোমেলো উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে সকলের জীবন, কিন্তু এত বড় জোয়ান মদ্দ সে, রোজগার করছে না—এ ছাড়া কওয়া বলার কথা কারো কিছু নেই। লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল, সিগারেটটা সত্যই বাপের পয়সায় কেনা। গলির ওপাশে কলতলার ধারে বস্তির মেয়েদের জল নিয়ে মারামারি করা দেখতে দেখতে সে ঘরের ভেতরের আলোচনা শুনছিল। প্রতিমা তখনো আশ্বাস দিয়ে চলেছে বাপ-মাকে যে দাদাকে সে চাকরি পাইয়ে দেবে, বলে কয়ে রাজী করাবে চাকরি করতে।

রাখাল তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে বয়স্থা চাকুরে বোনের গালে ঠাস করে বসিয়ে দিয়েছিল একটা চড়।

নিজে একেবারে চাকরিতে বাহাল হয়ে না এসে প্রতিমা এসব কথা বললে হয়তো মেজাজটা তার এতখানি খিঁচড়ে যেত না।

দীনেশ প্রায় মারতে উঠেছিল ছেলেকে, হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিল, এই দণ্ডে বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। দূর হয়ে যা—বজ্জাত পাষণ্ড গুণ্ডা —এখখুনি বেরো।

বাড়ীটা দীনেশের নয়, ভাড়াটে বাড়ী। আস্ত বাড়ীটারও সে ভাড়াটে নয়, মাত্র দোতালাটুকু। রাখাল সেই দণ্ডে এক কাপড়ে দীনেশের দোতলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল একতলায়। একতলার ভাড়াটে ফণি চক্রবর্তীর অল্পবয়সী বোকা বৌ মাধুরীর কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। টাকাটা অবশ্য ফণি চক্রবর্তী পরে আদায় করে নিয়েছিল দীনেশের কাছ থেকে। কিন্তু চাওয়া মাত্র রাখালকে টাকা দেবা[illegible]টাকে সে যে কতকাল মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে মাধুরীকে ঠেঙাবার ছুতো হিসাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসাব হয় না।

উপর থেকে মাঝে মাঝে প্রতিমাদের কাণে এসেছে ফণির বজ্রগর্জন : গেলেই হত রাখাল চাঁদের সঙ্গে? গেলি না কেন?

তারপর রাখালের আর কোন খবর মেলে নি। বৈশাখের মুহুর্মুহু বাজ ফেলা ঘন কালো আকস্মিক মেঘের মত যে জ্বালাভরা নিরু[illegible] হতাশার বিষাদ মহাসমারোহে ঘনিয়ে এসেছিল সেদিন এ বাড়ীতে, বাড়ীর দুটি তলাতেই, আজও তা একেবারে মিলিয়ে যায় নি, কয়েকটা বর্ষা শীত বসন্ত যদিও ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে।

অন্য সকলের বিষাদ কমে এল ক্রমে ক্রমে, প্রতিমার দুঃখ বেদনা গাঢ় ও গভীর হতে লাগল দিনে দিনে। দুরন্ত মর্মজ্বালার বৈশাখী ঝড়ো মেঘ উড়ে মিলিয়ে না গিয়ে পরিণত হয় জীবনের আকাশ-ঢাকা স্থায়ী শান্ত আষাঢ়ের বিষণ্ন ভিজে মেঘে। রাখাল নিরুদ্দেশ হয়েছিল শুধু এজন্য নয়, মহেশও চলে গিয়েছিল, এজন্যও অনেকটা। দু'জনে তারা ভাল চাকরি পাওয়ায় তাদের মিলনের বাতিল-যোগ্য বাধাগুলি তুচ্ছ ও অকারণ হয়ে গিয়েছিল, তবু তো মিলন তাদের হল না, মহেশ চাকরি করতে চলে গেল জব্বলপুর।

হাজার বার মনে মনে নাড়াচাড়া করেও প্রতিমা মহেশের যুক্তিটা বুঝতে পারে নি। অস্থায়ী চাকরি,—তাতে কি এসে যায়? যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তো চাকরি থাকবে। কবে যুদ্ধের শেষ কেউ কল্পনা করতেও পারছে না আজ। তাছাড়া, যুদ্ধের সঙ্গে অস্থায়ী চাকরিটা শেষ হলেও অন্য কোন চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে, এটুকু আত্মবিশ্বাস কি নেই মহেশের?

অথবা, সে বেশী মাইনের স্থায়ী চাকরি পেয়েছে বলে পুরুষের অভিমানে ঘা লেগেছে মহেশের, এটাই আসল কথা? প্রতিমা বিশ্বাস করতে চায় না; কথাটা কিন্তু কামড়ে থাকে মনের মধ্যে, তাকে ভাবতে হয়। জ্বালাভরা উদ্বেগের মতো চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মহেশের একটা ছেলেমানুষী অভিমান তাকে বাতিল করে দিয়েছে এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না, তবু সময় সময় এমন তুচ্ছ মনে হয় নিজেকে, এমন আঘাত লাগে তার নিজের অভিমানে!

তারপর মাইনের হিসাবে মহেশ তাকে ছাড়িয়ে গেল। তখন এদিকে জ্বালাটা কমল প্রতিমার। কিন্তু চাকরিতে এত উন্নতি করেও

মহেশ কেন ইতস্ততঃ করছে, অনেক দূরের ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভয়কে আঁকড়ে রয়েছে ভেবে, আসল জ্বালাটা তার বেড়েই গেল।

তাদের দু'জনকে দূরে সরিয়ে দিলেও দু'জনের চাকরি যে দুটি সংসারকে চালু রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে লড়াই তখন প্রচণ্ড জোরে চলা আরম্ভ করেছে। জিনিষপত্রের দাম চড়তে আরম্ভ করেছে হু হু করে, বাজার পরিণত হয়েছে চোরাবাজারে। লক্ষ লক্ষ সংসার হয়ে এসেছে অচল, টলমল। লক্ষ লক্ষ মানুষের না খেয়ে মরবার সম্ভাবনা বাস্তব সত্যে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে পথে ঘাটে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে। মহেশের বাবার পেনসনের টাকায় তাঁর অতবড় সংসার তখন কোনমতেই চলত না। পেনসন এক পয়সা না বাড়লেও সংসার চালানোর উপকরণের দাম বেড়েছে বহুগুণ, একটা টাকা যেন হয়ে গেছে দু'য়ানির সামিল। দীনেশের সংসারও অচল হত। তার সদাগরী আপিসের চাকরির মাইনে বাড়ল না এক পয়সা, আপিসটার আয় প্রায় আড়াইশ গুণ বেড়ে যাওয়ায় কর্তারা তাকে মাগগী ভাতা দিতে আরম্ভ করল সাড়ে তের টাকা।

দু'জনে তারা মেনে নেয়, মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পায় যে এদিক দিয়ে চাকরি করা তাদের সার্থক হয়েছে। কিন্তু নিজেরা সুখী ও সার্থক হয়েও তো অনায়াসে তারা চাকরি করে চালু রাখতে পারত সংসার দুটিকে। চাকরি পাওয়াতেই যখন বাধা সব বাতিল হয়ে গেল, মহেশ একা না পেয়ে দু'জনেই পাওয়াতে আরও বেশীরকম গেল, তখন জাতের তফাৎ নিয়ে অশান্তি হত না দু'টি পরিবারে। প্রতিমার মা বড় জোর বলত মাথা-কপাল চাপড়ে—জাত ধম্মোও নিলে মধুসূদন! কিন্তু

বরণডালা সাজিয়ে বেজাত জামাইকে সাদরে সাগ্রহে অভ্যর্থনাও যে করত সন্দেহ নেই—তার চাকরে মেয়ের বিনা খরচায় পাওয়া চাকরে জামাই। পাওনা-গণ্ডায় ঘাটতির আপশোষ মহেশের বাবা সামলে উঠত রোজগেরে বৌ পেয়ে—যার দেড় দু'বছরের রোজগার ছাপিয়ে যাবে একসঙ্গে পাওয়ার প্রত্যাশাকে। মিলনের জন্য উন্মুখ, উদ্‌গ্রীবও হয়ে উঠেছিল দু'জনেই। তবু পর হয়েই দূরে দূরে তাদের থাকতে হল কেন—এক অনিশ্চিত কালের জন্য, প্রতিমা ভেবে পায় না।

জব্বলপুর রওনা হবার আগের দিন সন্ধ্যায় মহেশ বিদায় নিতে এসে চা খেতে চেয়েছিল—খোলা ছাতে ঘামেভেজা জামা খুলে খালি গায়ে প্যাটিতে পা ছড়িয়ে পিছনে হেলে দুহাতে ভর দিয়ে বসে। দিনের অবসানে সন্ধ্যার বিচিত্র পরিবর্তনগুলি তখন সবে ঘটতে শুরু করেছে আকাশে ও পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আলো জ্বালা নিষেধ, সন্ধ্যাদীপের শিখা বাইরে থেকে নজরে পড়লেই জরিমানা, জেল। চাঁদ ও তারা মানুষের হুকুম না মেনে আলো ছায়ার ঝিকিমিকি খেলা শুরু করেছে। মৃদু বাতাস সস্নেহে মুছে নিয়ে যাচ্চে দু'জনের সারাদিনের কাজের শ্রান্তি আর ঘাম। ও বাড়ার কাঁকলাস কিশোরটার বাঁশের বাঁশীতে ছড়িয়ে পড়েছে আথালি পাথালি মাথা কপাল কোটা ব্যথার কাকুতি। ভয়ে তারা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কথা জড়িয়ে গিয়েছিল তাদের। নির্বাক স্তব্ধতায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। কিন্তু নিজের হাত দিয়ে অপরের হাতটি পর্যন্ত ছুঁতে তারা একজনও ভরসা পায়নি, অপরজনের মনে কষ্ট দেবার ভয়ে।

এক বছরের মধ্যে পারমানেণ্ট করে দেবে বলেছে।

ওদের কথা কি—?

যেদিন পারমানেণ্ট হব, সেদিন ছুটে আসব—ছুটি দিক না দিক। আজ যাই খেঁদি—কেমন যেন খারাপ লাগছে।

বলে মহেশ পালিয়ে গিয়েছিল! তার মুখের ভাষার মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রতিমার। তার নিজেরও অসহ্য লাগছিল প্রতিটি মুহূর্ত। বিদায় নেবার আগের দিন নির্জন ছাতে পরস্পরের সঙ্গ অসহ্য হয়ে ওঠা আর খারাপ লাগা একই কথা।

. .

ঠিকে ঝি আহ্লাদীর ছেলেটা একটানা কেঁদে চলেছে—রোয়াকের কোণে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছ'মাসের বাচ্চাটাকে সাথে নিয়েই সে কাজ করতে আসে, ঘরে ছেলে ধরবার তার লোক কেউ নেই। কাজে ফাঁকি দেয় না, একপাশে ছেলেটাকে ফেলে রেখে কাজ করে যায়, একটানা কান্না শুনেও ফিরে তাকায় না, শুধু প্রাণপণে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। মাঝে মাঝে তফাৎ থেকেই বাচ্চাটাকে উদ্দেশ করে বলে, এই যে সোণা! এই যে সোণা! এই যে সোণা!

প্রতিমা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বলে, একটু সামলে নাও ছেলেকে আগে।

তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাত ধুয়ে আহ্লাদী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মাই দিতে বসে।

গোড়ায় জানলে ওকে প্রতিমা রাখত না। প্রথম দু'দিন বাচ্চাটাকে আহ্লাদী সঙ্গে আনেনি—কোথায় কার কাছে ফেলে এসেছিল কে জানে! ছেলেটা মেঝেতে পড়ে কাঁদে বলেও আহ্লাদী যেন অপরাধী হয়ে

থাকে। অন্য ঝিদের তুলনায় সে তাই আশ্চর্যরকম নরম, ভালভাবে কাজ করতে উৎসুক!

আপিসের বেলা হয়ে গেছে, স্নানের ঘরে তাড়াতাড়ি গায়ে মুখে একটু সাবান ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে প্রতিমা ভাবে, বিয়েটা যদি তারা সেরেই ফেলত মহেশ জব্বলপুর যাবার আগে, একটা বাচ্চা যদি তার হত আহ্লাদীর মত, আর আপিসের মেঝেতে বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে তাকে কাজ করতে হত পেটের দায়ে—

সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে প্রতিমার। পেটের দায়ে মানুষ কি করতে পারে আর মানুষকে কি করতে হয়, ভাবতে গেলেই গত মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতি শুধু এই শহরের বুকে যতটা প্রকট হয়েছিল চোখের সামনে তার ছবি নাড়া খায়—আজও তাজা হয়ে আছে মনের মধ্যে। পেটের দায়ের বাস্তব চেহারা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিজেরও অভিজ্ঞতায়। চাকরির রোমান্স নিঃশেষে উপে গিয়েছে। এ খুসীর চাকরি নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার। নিজের আর আপনজনদের পেটের দায়েই তার চাকরি—নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে। বুড়ো দীনেশ রোগে অশক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে আপিস থেকে এক মাসের ছুটি ও এক মাসের বেতন দিয়ে। কুড়ি বছর বয়সে শুরু করে একত্রিশ বছর একটানা কাজ করে যাওয়ার কি অপূর্ব পুরস্কার! প্রতিমার রোজগারে আজ সংসার চলছে এক বছরের বেশী। মাইনে বেড়েছে দশ টাকা। তার অনেক পরে কাজে লাগলেও ইতিমধ্যেই দুটো ইনক্রিমিণ্টে মীণার বেড়েছে পঞ্চাশ,—তার বেলা দশ টাকা। কি আর করবে, কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করাটা তার আয়ত্ত হয়নি। তাই তার শুধু কাজের মাইনে। কাজটা সুসপন্ন হওয়া আপিসেরই

প্রয়োজন, তাকে দিয়ে ভালভাবেই কাজ চলছে, এইটুকু তার দাম পুরুষ কাউকে রাখতে হলে অনেক বেশী মাইনে দিতে হত, এও তার একটা রক্ষাকবচ। অন্য দাম না দিয়েই সে তাই রেহাই পেয়েছে। নইলে হয়তো ঘোষ সায়েবের সঙ্গে গাড়ীতে যেতে অস্বীকার করার পরদিন থেকেই চাকরি আর তাকে করতে হত না।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মনের ভাব বদলে যায়। মুখে এক কলি গানও গুণগুণিয়ে ওঠে। কাল থেকে সে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তেজনা বোধ করছে। সবার সঙ্গে তার জীবনকেও এলোমেলো অর্থ হীন ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে চলেছে যে কুচক্রীরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ গত ক'বছরে স্থায়ী হয়ে গেছে তার মধ্যে, মহেশ আসছে এ খবরের ক্ষমতা ছিল না সাময়িক ভাবেও তা কাটিয়ে দেয়। মেঘের ফাঁকে রোদ্দুরের মতই তার উল্লাস জাগছিল আবার ঢেকে যাচ্ছিল।

আজকালের মধ্যে আসবে লিখেছে মহেশ। আর কিছু লেখে নি। চাকরি থেকে সে যে ছাঁটাই হয়েছে, প্রতিমা তা জানে। মহেশ কিন্তু জানায় নি। কেন জানায় নি কে জানে! কি ভেবেছে মহেশ? কি স্থির করেছে? জানবার জন্য ছটফট করে প্রতিমার মন। এতদিন ধরে যত চিঠি লিখেছে মহেশ তাকে, ভবিষ্যতের কথা এড়িয়ে গিয়েছে সবগুলিতে। মাঝে মাঝে শুধু লিখেছে যে অন্য ডিপার্টমেন্টে ট্র্যানসফার হয়ে গিয়ে স্থায়ী চাকরি পাবার আশা আছে।

তাড়াহুড়ো করে স্নান সারতে পারে না প্রতিমা, তাই তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে খাওয়া সারতে হয়। দীনেশের এসব ছিল টাইম বাঁধা কাজ। ঘড়ি ধরে নাইতে যেত, মগ গুণে মাথায় জল ঢালত, খেতে সময় লাগত না একমিনিট বেশী বা কম, রান্নার পদ বেশী হলেও নয়;

কম হলেও নয়। এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যেত না দীনেশের, আস্তে চালানো কলের মত ধীরে সুস্থে নাওয়া-খাওয়া সেরে, জামা জুতো পরে, ছাতাটি বগলে নিয়ে, ঠিক সময়ে আপিসে রওনা হত। সেও হয়ত ওরকম হতে পারবে, আরও কয়েক বছর চালিয়ে যাবার পর। নাইতে যাবার আগে তার যে অদ্ভুত আলস্যটা আসে, উঠি উঠি করেও উঠতে পারে না, চটপট স্নানটা সেরে নেবে ভেবেও স্নানের যে আরামটা নেশার মত পেয়ে বসায় কিছুতে স্নান সংক্ষিপ্ত করতে পারে না, সে আলস্য আর আরামের নেশা হয় তো একদিন তার কেটে যাবে। চাকরিতে বাপের মত হয়ে চেহারাতেও হয় তো বাপের মত হয়ে যাবে ততদিনে—গোল-গাল মোটা।

আগের চেয়ে সে অবশ্য রোগাই হয়ে গেছে এ ক'বছরে, মোটা হবার কোন সূচনা এখনো দেখা দেয়নি।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি আপিসের কাপড় পরছে, মহেশ এসেছে খবর পৌঁছল। প্রতি মুহূর্তে সে তার আবির্ভাব প্রত্যাশা করছিল, তবু তার মনে হল যেন এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সর্ব্বাঙ্গ কিছুক্ষণ শিথিল অবশ হয়ে রইল তার রোমাঞ্চের পর। চোখ বুজে ঢোক গিলে মাথায় সে একবার ঝাঁকি দিয়ে নিল। কি বিশ্রী, কি অস্বাভাবিক এই উগ্র কামনা নিয়ে এত দীর্ঘকাল একজন মানুষের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় দিন গোনা, দেহমন যা এমন ভাবে ক্ষয় করে আনে। কাপড় ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে প্রতিমা, আরেকটু দেরী করতে হলো, হঠাৎ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল এক পশলা।

মহেশ রোগা হয়নি, আরও শক্ত সমর্থ সুশ্রী হয়েছে চেহারা। গাল

ভয়ে ওঠায় তার মুখের চামড়া একটু রুক্ষ হওয়াতে বেশ জবরদস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ফিরে এলে শেষ পর্য্যন্ত?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

সবে তারা কথা সুরু করেছে, দীনেশর ভাঙ্গা গলার আওয়াজ ভেসে আসে, দশটা বাজে খেঁদি। আপিসে লেট হয়ে যাবে।

মহেশের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাতে বুলাতেই নীচু গলায় প্রতিমা বলে, চলো বেরিয়ে যাই, কোথাও বসে কথা বলা যাবে নিশ্চিন্ত মনে। আপিস কামাই করেছি জানলে বাড়ীতে সবাই খেয়ে ফেলবে প্যান-পেনিয়ে, পাছে চাকরি যায়।

আপিস যাবে না? মহেশ জিজ্ঞেস করে রাস্তায় নেমে।

আজ আপিস যাব? প্রতিমা বলে ভৎর্সনার সুরে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই সারাদিন কেটে যাবে না? অনেক ঝগড়া আছে। প্রথমে বলে দিকি, একটিবার ছুটি নিয়ে এলে না কেন? বারবার লিখলাম, তবু?

দুচারদিনের জন্য আসতে ইচ্ছা করত না। সাতদিনের বেশী ছুটি দিল না একসঙ্গে। তাছাড়া—

তা ছাড়া—?

নাঃ। এমনি।

আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুলে প্রতিমা মহেশের মুখের দিকে তাকায়। একে কিছু বলতে সুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে মনের কথা মনে রেখে দেওয়াতে স্বভাব তো ছিল না মহেশের! মহেশের মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ তাকে

আহত করে। প্রায় চার বছর পরে দেখা—এখনো পাঁচমিনিট পূর্ণ হয়নি!

চাকরির কথাটাও বলতে গিয়ে বলতে পারছে না মহেশ, প্রতিমা বুঝতে পারে।

মহেশকে এককাপ চাও দেওয়া হয়নি মনে ছিল প্রতিমার। চায়ের দোকান সামনে পড়ায় সে মহেশকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। সে নিজেও চা খাবে। চাকরিতে ঢুকে চায়ের পিপাসা অদ্ভুত রকম বেড়ে গেছে প্রতিমার। পেলেই খায়, ভাত খাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে খেতেও বাধে না। মাঝে মাঝে অম্বলে বুক জলে,--তবু। স্কুল কলেজ আপিসের টাইম, দেশী রেষ্টুরেণ্টটি প্রায় খালি। চায়ে গুড়ের গন্ধ। মহেশ মুখ বাঁকায়। প্রতিমা নির্বিচারে খেয়ে যায়, তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

এইখানে এতক্ষণ পরে মহেশ চাকরির কথা বলে। তার কথার ঝাঁঝে চমক লাগে প্রতিমার।—কি ভাবে ঠকালো ত্থাখো। দুবছর আগে পারমানেণ্ট চাকরি পেয়েছিলাম একটা, রিজাইন দিতে চাওয়া মাত্র মাইনে বাড়িয়ে দিল, একরকম কথা দিল যে নিশ্চয় পারমানেণ্ট করে দেবে। আজ এক কথায় ছাঁটাই। বললে, এখানকার লেবার একস্চেঞ্জ চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। চার পাঁচদিন ধন্না দেবার পর কাল এক ইউরোপীয়ান ফার্মে পাঠিয়েছিল, ম্যানেজার বলল, ষাট টাকার একটা চাকরি দিতে পারি। ষাট টাকা!—

চার পাঁচ দিন—? প্রতিমা সংশয়ভরে প্রশ্ন করে।

আমি এসেছি দিন সাতেক। ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক করে নিয়ে তারপর—।

টেবিলের সস্তা শ্বেত পাথরে কুনুই রেখে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকে চুপ করে। মহেশের তীব্র আতঙ্ক সে টের পায়, ছোঁয়াচ লেগে কেঁপে কেঁপে যায় তারও বুক। এ-তো সহজ কথা নয়! এমনভাবে হতাশ, দিশেহারা হয়ে গেছে মহেশ! মহেশ ছাঁটাই হয়েছে একথা আগে জানলেও তার তো বিশেষ ভাবনা হয়নি। সে ধরে নিয়েছিল, যুদ্ধের চাকরি গেছে তো গেছে, মহেশ আরেকটা চাকরি জুটিয়ে নেবে, নয়তো অন্য কিছু করবে। এই কদিনের চেষ্টায় চাকরী জোটেনি বলেই এমন ভয় পেয়ে গেছে মহেশ, এমন উতলা হয়ে উঠেছে! এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তার আত্মবিশ্বাস! এতকাল পরে বাড়ী ফিরে দুটো দিন বিশ্রাম করেনি, একটা কিছু ঠিক করে না নিয়ে তাকে মুখ দেখাতে চায়নি সাতদিনের মধ্যে!

প্রতিমা খুঁৎ দমে যায়। সহানুভূতিতে বুক তার ভরে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত গর্ব আর উল্লাস সে অনুভব করে অনেক দিন পরে, চার বছরের প্রতীক্ষাক্লিষ্ট ঝিমানো হৃদয় নতুন সুখ ও গৌরবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার জন্য, তারই জন্য মহেশের এই বিব্রত, বিপন্ন অবস্থা। চাকরি স্থায়ী নয় বলে চারবছর তাকে কষ্ট দিয়ে চাকরি হারিয়ে এসে দিশেহারা হয়ে গেছে মহেশ, পাগলের মত একটা কিছু ঠিক করার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে চারিদিকে। কিন্তু সাতদিনের বেশী দূরে থাকতে পারে নি। ব্যর্থ হয়ে, হতাশ হয়ে তারই কাছে ছুটে এসেছে সান্ত্বনার জন্য, দরদের জন্য। মমতায় অবশ্য বুকটা টনটন করে প্রতিমার, কিন্তু সে কি করে ঠেকাবে পুলকের রোমাঞ্চ, নোংরা গরম চায়ের দোকানে যদি বাস্তব হয়ে ওঠে তার মানস বাসর, ট্রাম বাসের আওয়াজ যদি গান হয়ে ওঠে তার কানে!

কেন ভাবছ তুমি? প্রতিমা বলে দরদের অনুযোগে, একটা কিছু হবেই। দুটো মাস নয় ঘরেই বসে রইলে, কি এসে যায়? এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে?

কি হয়েছে? এতক্ষণ পরে এই প্রথম বিশ্রী একটু হাসি ফোটে মহেশের ঠোঁটে, দু'মাস ঘরে বসে থাকলে—না-খেয়ে মরবে না সবাই?

প্রতিমা মরে যায়। সবাই মরে যাবে না খেয়ে, এই আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে মহেশ—তার জন্য নয়! ক্ষীণস্বরে কোনমতে বলে, তোমার বাবা তো পেনসন্ পান—?

মহেশ দু'চোখে অবিশ্বাস্য বিস্ময় নিয়ে তাকায় প্রতিমার দিকে।—বাবা? প্রায় একবছর হল বাবা মারা গেছেন, জানো না তুমি?

প্রতিমা জানত না। মহেশ কোন চিঠিতে এ খবরটা তাকে জানায়নি। মহেশ চলে যাবার পর প্রথম দিকে ন'মাসে ছ'মাসে দু'-চারবার অল্প-সময়ের জন্য প্রতিমা তাদের বাড়ি গিয়েছিল, তার পর নিজের জীবনচক্রে পাক খাওয়ার ধাক্কা সামলে চলতেই এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে আর যাওয়াও হয় নি, খোঁজ খবরও নেওয়া হয় নি। প্রতিমাকে মানতে হয় নিজের মনে, খোঁজ নেবার তাগিদও সে অনুভব করেনি বিশেষ। আপনজনকে আপন ভাবা হয়ে ওঠেনি তার, তারা মরল কি বাঁচল ভাববার অবসরও হয় নি। মহেশই তার মন জুড়ে ছিল কি ও তার বাড়ীর লোকেরা এতটুকু স্থান পায় নি সেখানে। এমন স্বার্থপর সে? কান দুটি গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে প্রতিমার, লজ্জায়—ক্ষোভে।

তুমি তো লেখো নি কিছু। প্রতিমা বলে মরিয়া হয়ে, সরল ভাবে। বাবার অসুখ হল, বিছানা নিলেন, চাকরি গেল। সেই থেকে আমি

একা সংসার চালাচ্ছি। সোজা ঝঞ্ঝাট! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। মামাতো বোনের বিয়ে হল, সে বিয়েতে পর্যন্ত যেতে পারলাম না—আমি যে কি অবস্থায় আছি।

প্রতিমার চোখ ছলছল করে এসেছে দেখে মহেশ বিব্রত, শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাকে বিব্রত, শঙ্কিত হতে দেখে প্রতিমা আত্মসম্বরণ করে। প্রশ্ন করে—বাস্তব, যুক্তিসঙ্গত।

তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছিলে। কিছু জমাও নি?

জমাই নি? সাতশো টাকা ধার জমিয়েছি! আমি একবার রাগ করে বাবাকে লিখেছিলাম, বড় বেশী খরচ হচ্ছে। বাবা তার জবাবে একমাসের খরচের হিসেব পাঠিয়েছিলেন। সাতজনের দু'বেলার মাছ—একপোয়া! ছোট্‌কুর জন্য একপোয়া দুধ, পেট ভরে না বলে আদ্দেকের বেশী বার্লি মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। আফিম খান বলে বাবা আগে দেড় সের দুধ খেতেন, সেটা কমিয়ে দেড় পোয়া করেছেন। আর—

মহেশ সজোরে মাথায় ঝাঁকি দেয়, পরের মাস থেকে আরও পঁচিশ টাকা বেশী পাঠাতাম—অবশ্য নিজের খরচ কমিয়ে।

কথা যেন শেষ হয়ে যায় তাদের। আপিস কামাই করে সারা দিন মহেশের সঙ্গে কথা বলবে ভেবেছিল প্রতিমা, সাড়ে দশটার সময় সে আর বলার কথা খুঁজে পায় না। ট্রাম মোটরের শব্দকে তলিয়ে দিয়ে কিছুদূর থেকে এক মিছিলের আওয়াজ ভেসে আসে। চায়ের দাম মিটিয়ে তারা ফুটপাথে নেমে দাঁড়ায়। প্রৌঢ় যুবা কিশোরের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা এগিয়ে এসে সামনে দিয়ে চলে যায়, গায়ে তাদের ব্যাজ আঁটা। এরা সবাই শিক্ষক, দেশের সবচেয়ে নিরীহ গোবেচারি অল্পে-সন্তুষ্ট শান্তশিষ্ট মানুষ। তারা আজ মরিয়া হয়ে দল বেঁধে শহরের পথে মিছিল করেছেন।

ঠিক সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে রিক্সার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ঘর্মাক্ত রিকসাওয়ালা। পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকানে অল্প একটু জায়গায় পাঁচজন লোক ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে হাতে বিড়ি বানাতে বানাতে, চোখ তুলে তুলে মিছিল দেখছে। ঝাঁটা হাতে যে তিনটি মেথরানী উপর তলার ব্যাঙ্কের ফুটপাথ-ঢাকা অলিন্দের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস উপেক্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিছিলের দিকে, বারবার তাদের দিকেই তাকায় প্রতিমা। তিনজনেই যে ওরা জননী সে টের পায়—কম বয়সী ছিপছিপে মেয়েটা পর্যন্ত!

হঠাৎ প্রতিমা ব্যগ্র ভাবে নীচু গলায় বলে, আমি দেড়শো পাই, তুমি যদি ষাট টাকার ওই চাকরিটা নাও—গলা বন্ধ হয়ে যায় তার। ঠোঁট কামড়ে সে মাথা নামায়। মহেশের কাছে থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মুখ তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে ভাবে, ভাগ্যে তার কথা মহেশ শুনতে পায়নি!

আমি আজ যাই খেঁদি?

আচ্ছা।

পরশু আসব। কাল একটা এপয়েণ্টমেণ্ট আছে। দেখি কি হয়।

পরশুই এসো! বিকেলে এসো—ছটার সময়।

আচ্ছা।

মিছিলের পিছনের টামে উঠে মহেশ যেন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবোর্ডে—দরজার মাঝখানের রডটা আঁকড়ে ধরে, অন্য মানুষের শরীরগুলির সঙ্গে সেঁটে গিয়ে। ফিরে সে তাকায় না, একবারও না।

প্রতিমা চায়ের দোকানে ঢুকে আরেক কাপ চা খায়। হাত ঘড়িতে

সময় ছাখে—এগারটা প্রায় বাজে। পৌঁছতে সাড়ে এগারটা হবে। মিছামিছি আপিস কামাই করে কোন লাভ আছে কি? তার চেয়ে নয় লেট হবে। মীণাত' প্রায়ই লেট করে আসে, সে নয় একদিন লেট হবে। আপিস যদি সে না যায়, কি করার আছে তার, কোথায় সে যাবে, সারাটা দিন কাটাবে কোথায়, কি নিয়ে?

চায়ের দাম দিয়ে প্রতিমা বাসে ওঠে। বাসে যত ভিড় হোক, বসতে পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলি আসনের উপরে লেডিজ সিট লেখা থাকে—লেডি কেউ উঠলেই কণ্ডাক্টর পুরুষদের উঠিয়ে দিয়ে লেডিকে বসিয়ে দেয়। দেহে ভীরু কাপুরুষ হস্তার্পণ থেকে বাঁচা যায় বসতে পেলে।

আপিসের কাছে গিয়ে কিন্তু সে বাস থেকে নামে না। একটা দারুণ অনিচ্ছা, কঠোর প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জীবনে আর সব কিছু অর বাতিল হয়ে যাবে, শুধু থাকবে আপিস? ছুজনের কথা তার মনে পড়েছে, আপিসে দিন কাটাবার অভ্যাস যখন হয়নি তখন যাদের যে কোন একজন সঙ্গে থাকলে দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরও পেত না—শুধু গল্প আর কথায়। কতকাল দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। আজ আপিসে না গিয়ে মিনতি আর সুধার বাড়ীতেই ভাগাভাগি করে কাটিয়ে দেবে দিনটা।

গলির মধ্যে মিনতিদের বাড়ী। ভেতরে ঢুকেই প্রতিমার চোখে পড়ে, মিনতির বড় ভাই মাখন বারান্দায় খেতে বসেছে। এতদিন পরে প্রতিমাকে দেখে সে নির্জীবের মত বলে, অনেকদিন পরে এলেন।

আপিস যান নি?

আপিস? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আবার আপিস কিসের?

কেন, আপনার তো যুদ্ধের চাকরি ছিল না?

সোজাসুজি না হোক, তাই ছিল বৈকি। যুদ্ধের জন্য কাজ বেড়েছিল, বেশি লোক নিয়েছিল। এখন কাজ কমেছে, ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মাখনের বৌ আসছিল, কন্ট্রোলের মোটা ছেঁড়া ছোট কাপড় পরা। পাতের সমস্ত ভাত মাখন ডাল দিয়ে মাখছে, থালায় আর শুধু একটু ঝিঙে কুমড়োর তরকারি। বাটি থেকে জলের মত পাতলা আরেকটু ডাল মাখনের বৌ তার পাতে ঢেলে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্জীবের মত প্রতিমাকে বলে, ভাল আছেন ?

ম্লান বিষণ্ণ তার মুখ।

ঘরে থেকে মাখনের মা কথা শুনছিলেন, বেরিয়ে এসে প্রতিমাকে বলেন, আর বোল না মা, চারিদিক থেকে লেগেছে। জামাইকেও নাকি ছাড়িয়ে দেবে দু'একমাসের মধ্যে।

মিনতিও ওই কথাই বলে যায় আগাগোড়া। এতদিন পরে সখীর সঙ্গে দেখা, বলার যেন তার আর কথা নেই।

এবারেই গেছি আমি, মিনতি বলে, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী, সেখানে পাঠিয়ে দেবে বলছে। অ্যাদ্দিন চাকরি ছিল, মাসে মাসে খরচ দিয়েছে, শ্বশুরবাড়ী থাকতে লজ্জা করে নি—চাকরি গেলে একদিনও থাকতে পারবে না, অপমান বোধ হবে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে নিজে মেসে হোটেলে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। আমি যত বলি, তুমি হোটেলে থাকতে চাও থাকো, আমি এখানে থাকলে দোষ কি ? তা রাখবে না। বেশি বলতে গেলে চটে যায়। এমন বিশ্রী মেজাজ হয়েছে আজকাল—

প্রতিমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত বাড়ীতে থমথম করছে জমজমাট বিষাদ। মিনতির কথায় শুধু হতাশা, দুর্ভাবনা, ভয়।

বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত এ বাড়ীতে থাকবে ভেবেছিল প্রতিমা, আধঘণ্টার মধ্যে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে সে হাঁপ ছাড়ে।

সুধার কাছে যাবার ইচ্ছটা অনেকখানি উপে গিয়েছে। সেখানে গিয়েও যদি একটু হাসি আনন্দের বদলে এমনি বিব্রত সঙ্কটাপন্ন মানুষের হতাশার কাহিনী শুনতে হয়? শুনতে হবে কি হবে না জানবার তাগিদটাই যেন তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠিয়ে দেয়। সুধা থাকে শহরের আরও উত্তরে, স্বামীর সঙ্গে ভাড়াটে বাড়ীতে। মিনতির অনেক আগেই সুধার বিয়ে হয়েছিল, তার তিনটি ছেলে মেয়ে, গত বছরখানেকের মধ্যে সংখ্যাটা যদি আর না বেড়ে থাকে।

ধীরেন নিজেই দরজা খুলে দেয়। বাড়ীটা শূন্য, নিঝুম মনে হয় প্রতিমার।

সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি ওমাসে।

হঠাৎ?

ধীরেন একমূহূর্ত চুপ করে থাকে। বোধ হয় তার মনে পড়ে এই মেয়েটি সুধার প্রিয়তমা সখী, তার সঙ্গেও এর পরিচয় আত্মীয়তার মত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপার হল কি, একটা বড় বিপদে পড়ে গেলাম। আপিসে হঠাৎ ডিগ্রেড করে দিলে, মাইনে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। আমার কাজের দোষ দেখালে কতগুলি, কিন্তু আসল কথা হ'ল লড়াই থেমে গেছে, একটা ছুতো করে মাইনে কমিয়ে দিল। রিজাইন দিই তো দেব, ওই মাইনেতে অন্য লোক নেবে। ভেবেছিলাম রিজাইন দেব, কিন্তু—

ধীরেন একটু হাসে। করুণ নয়, মর্মান্তিক জ্বালা ভরা হাসি।

দেখলাম, ও টাকায় বাসা করে থাকা যায় না, অগত্যা সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম দেশে। আগাম ভাড়া দেওয়া আছে বাড়ীটার, নিজে তাই এ মাসটা আছি।

আপিস যান নি?

আজ ছুটি। বড় মালিক মশায় কাল নরকে গেলেন, তাঁর সম্মানে ছোটমালিক মশায় আজ ছুটি দিয়েছেন।

মাথা ঘুরছিল প্রতিমার! আপিসে পার্টিশনের ছোট ঘুপচিটির মধ্যে নিজের অভ্যস্ত চেয়ারটির জন্য মন তার উতলা হয়ে ওঠে, ওইখানে সে যেন আড়াল হতে পারবে জগৎ থেকে, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

প্রতিমা সোজা আপিসে চলে যায়। বাড়ীতে দীনেশের অসুখের জন্য দেড়টার সময় আপিসে আসার কৈফিয়ৎ উপরওলা বিশ্বাস করে, আপিস ফাঁকি দেবার স্বভাব প্রতিমার নয়।

সারাদিনের শ্রান্তি প্রতিমাকে কাবু করতে পারে না, আপিস থেকে ফিরবার সময় শ্রান্তিতে বরং তার দেহ মন শান্ত হয়ে যায়। উদার ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে মনটা। ক্ষমা অবশ্য সে করে না চক্রীদের, যাদের চক্রান্ত জীবনটা তার দুঃখের তাণ্ডবে পরিণত করেছে, কিন্তু নিজের মর্মের শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে অর্থহীন ভাবপ্রবণতার আত্মরতিকে এখন সে প্রশ্রয় দেয় না। তার নিজের জীবনের সমস্যা ও ব্যর্থতা বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে যায় অসংখ্য জীবনে, নিজেকে ভুলে সে ভাবতে থাকে অন্য সংখ্যাহীন মানুষের কথা।

বাড়ীর সদরের চৌকাট পার হবার সময় আহ্লাদীর ছেলের কান্না

শুনতে পায় না আজ। প্রতিমা আশ্চর্য হয়, ভাবনায় পড়ে যায়। আহ্লাদী তাহলে আজ কামাই করেছে, কাজে ফাঁকি দিয়েছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানোর কাজগুলি হয়তো এখনো স্থগিত রেখেছে বাড়ীর লোক আহ্লাদীর আসবার আশায়, সারাদিন খেটেখুটে এসে এই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে এখন তাকে আবার ওই সব কাজে হাত লাগাতে হবে।

কলতলা থেকে বাসনের পাঁজা নিয়ে আহ্লাদী রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে প্রতিমা দেখতে পায় ভেতরে ঢুকেই, তারপর তার চোখ পড়ে বারান্দার কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ানো ঘুমন্ত শিশুটার দিকে।

বাসন রেখে এসে আহ্লাদী বলে, জ্বর হয়েছে দিদিমণি, গা-পোড়া জ্বর। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কাজ করতে এলি কেন তুই? ধমক দিয়ে বলে প্রতিমা।

না এলে তো মাইনে কাটবে। খাব কি? আহ্লাদী বলে দাঁতে দাঁত কামড়ে।

প্রতিমা বারকয়েক তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেয়।

তোর স্বামী কি কাজ করে?

এতদিন এখানে কাজ করছে, প্রতিমা কোনদিন তার ঘরের খবর একটিও জিজ্ঞেস করে নি। আহ্লাদী চোখ নামায়। মুখের তীব্র আক্রোশের ভঙ্গিটা তার নরম হয়ে আসে।

কলে খাটে। একটু থেমে যোগ দেয়, একজনের রোজগারে চলে না দিদিমণি।

একথা যেন বলার দরকার ছিল, কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে বলে জ্বরে কাহিল শিশুটাকে নিয়ে সে কাজ করতে এসেছে, তার

পরেও ! অথবা দরকার ছিল ? দিন চালানোর দায়ে আহ্লাদী ছেলে নিয়ে বাসন মাজতে আসে তার ঘরে এ তো চিরদিন সে জানত, কিন্তু সে যে কেমন দায় আজকের মত এমন মর্মে মর্মে কি জানতে পেরেছিল সে কোনদিন ? যাঁতা কলে নিজের জীবনটা পিষে যাচ্ছে জেনেছে বলে, মহেশ, মিনতি, তার স্বামী, মাখন, তার মা, বৌ, সুধা, ধীরেন এদের জগতের জীবনগুলি পিষে যাচ্ছে অনুভব করেছে বলে, তবেই না আজ তার মনে পড়েছে এমন কত আহ্লাদী আর তার স্বামী আছে—যারা গুঁড়ো হচ্ছে এই পেষণে ? অন্ধকারে ছোট মেয়ের ভয় পাওয়ার মত অদ্ভুত এক অন্ধ আতঙ্ক জাগে প্রতিমার। কোলের ছেলে মাটিতে ফেলে আহ্লাদীকে তার বাসন মাজতে হয়, তবু একবেলা কামাই করলে সে তার মাইনে কাটে, এই পাপের ফল কি ফলছে তার জীবনে ? আহ্লাদীদের অভিশাপ কি লেগেছে মিনতিদের, সুধাদের, মাখনের মা-বৌদের জীবনে ?

গুণ্ডামী

ট্রাম এল মানুষ বোঝাই। গাড়ী দাঁড়াবার আগেই শান্তা লক্ষ্য করেছে, লেডিজ্‌-সিট খালি নেই একটিও। ঠেলে ঠুলে উঠে কোন রকমে দাঁড়াবার একটু স্থান হতে পারে। তবু শান্তা এই ট্রামেই উঠে পড়ল। এ সময় এখানে আজকাল লেডিজ্‌-সিট প্রায় খালি থাকেই না, সে-আশায় থাকলে কটা ট্রাম ছেড়ে দিতে হবে ঠিক নেই। তার চেয়ে উঠে পড়াই ভাল। মেয়েরা কেউ হয়তো কিছু দূর গিয়ে নেমে যেতে পারে। পুরুষেরা হয়তো কেউ সিট ছেড়ে দিতে পারে। দু'জনের বেঞ্চের একজনের এ সুমতি হলে অন্যজনের মনে যাই থাক আর যাই মনে হোক, তারও আসন ছেড়ে উঠে না দাঁড়িয়ে উপায় থাকে না। শান্তা তখন প্রথমে ভিতরের দিকে জানালা ঘেঁষে বসবে। তারপর এ ভদ্রতা যিনি করেছেন তাকে ডেকে পাশের জায়গা দেখিয়ে বলবে, 'আপনি বসুন।

যদি কেউ ভদ্রতা করে!

মেয়েদের জন্য রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা হবার পর থেকে কি যেন হয়েছে পুরুষদের, কদাচিৎ এ ভদ্রতা পাওয়া যায়। ভদ্রঘরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়েও একান্ত উদাসীনের মত মুখ করে ঠায় বসে

থাকে। ওরকম ভাব করে বলেই বিশ্রী লাগে শান্তার। যদি একেবারে গ্রাহ্য না করত, সচেতন হয়ে না উঠত, কিছুই মনে করত না সে। তবু, এরা শুধু ভদ্রতা না করেই ক্ষান্ত, কত লোক যে কি বিশ্রী অভদ্রতাও করে ভিড়ের সুযোগে। মেয়েদের কাছে সেই অভদ্রতার এমন বিবরণ শান্তা শুনেছে যে রক্তে তার আগুন ধরে গেছে। ব্যাপারটা কল্পনা করতে গিয়ে চুপচাপ বিনা প্রতিবাদে সে অপমান ওরা কি করে সহ্য করে গিয়েছে, শান্তা ভেবে পায় নি। ভিড়ে অতলোকের মধ্যে বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা করতে ওদের নাকি লজ্জা করে। লজ্জা! মানুষের কুৎসিত নির্লজ্জতা সয়ে-যাওয়া মেনে-নেওয়া লজ্জাবতী লতা সব। ধিক্!

মাঝে মাঝে ট্রামে মানুষের অসভ্যতার পরিচয় শান্তাও অবশ্য পেয়েছে। কিন্তু সে সব খুব সামান্য, তুচ্ছ ব্যাপার। অন্যায়টুকু ইচ্ছাকৃত কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেছে। ভদ্রবেশধারী মানুষগুলির মধ্যে কে দোষী তাও সব সময় সে ঠিক করতে পারে নি।

মাধবী, অনুপমা আর শোভার মত অপমান যদি তার জুটত একদিন! একজন হোক আর পাঁচজন হোক তৎক্ষণাৎ সে বুঝিয়ে দিত সেই বজ্জাত গুণ্ডাদের যে সব বাঙ্গালী মেয়ে নিরীহ গোবেচারী নয়, হাঙ্গামা বাধাতে, মজা টের পাইয়ে দিতে ভয় পায় না, দ্বিধা করে না, এমন মেয়েও আছে। ট্রামে বাসে মেয়েদের প্রতি এক শ্রেণীর লোকের পশুর মত আচরণের বিরুদ্ধে শান্তার মনের তীব্র প্রতিবাদ প্রায় এই আপশোষের রূপ নিয়েছে যে অন্ততঃ একটা পশুকেও উপযুক্ত শাস্তি দেবার সুযোগ তার জুটল না!

সব দিন সমান যায় না। এতদিন পরে সুযোগ তার আসে আজ।

ট্রামে উঠবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, লেডিজ্ সিটের কাছাকাছি গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের জন্য যে নয় তাতে এতটুকু সংশয়ের অবকাশও থাকে না। এ ইচ্ছাকৃত কুৎসিত হস্তক্ষেপ।

ফুঁসে উঠে শান্তা ঘুরে দাঁড়ায়। দোষী হবে একজন, সম্ভবপর দু'জনের মধ্যে। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে চাদর, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। মাথার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে সীঁথি প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু সযত্নে আঁচড়ানো। গোঁপ দাড়ি চাঁছা মুখে গম্ভীর বিষাদ, চোখ হয় রাত জাগার জন্য নয় অসুখের জন্য নিষ্প্রভ। তার পাশে দামী গরম কোট গায়ে এক যুবক, মাথার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে, চোখে চশমা, মুখে ব্রণের দাগ আর ভদ্রজীবনযাপনে ভদ্রমানুষের মুখে যে একটা মৃদুতা বা কমনীয়তার আবরণ পড়ে তার বদলে দুর্দান্ত বিশৃঙ্খল জীবনের ছাপ। তাকানিটাও স্পষ্ট আর উদ্ধত। রোগাটে গড়ন হলেও গায়ে বেশ জোর আছে মনে হয়—ভদ্রজীবন যাপনে যেমন হয় না শরীরটাও সে রকম শক্ত। বাঁ হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল ধরে আছে, মদের কিনা কে জানে! ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখে বোতল ধরা বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে রডটা চেপে ট্রামের দোল সামলাচ্ছে, খালি হাতে রডটা ধরে নি কেন অনুমান করতে যেন কষ্ট হবে শান্তার! ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই যে সে হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছে দোষ গোপন করার চেষ্টায়, বোকাও তা বুঝতে পারে।

ডান হাতে ছেলেটির বাঁ গালে শান্তা সজোরে চড় কষিয়ে দেয়। তার চশমাটা ছিটকে পড়ে, পরক্ষণে শোনা যায় কার পায়ের চাপে চশমার কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ।

বজ্জাৎ গুণ্ডা কোথাকার! শান্তা গর্জ্জন করে বলে, তোমাদের জন্য মেয়েরা ট্রামে চলা ফেরা করতে পারবে না?

আরোহীদের দিকে সে মুখ ফেরায়।—ভিড়ে ঠেলাঠেলি হয়, কিছু মনে করি না। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে মেয়েদের গায়ে হাত দেবে, বজ্জাতি করবে, আপনারা তা সয়ে যাবেন চুপচাপ?

খুব একচোট মারধোর চলে। হৈ চৈ হাঙ্গামার হদিস পেয়েই ড্রাইভার ট্রাম থামিয়ে দেয়। লোকটির হাত থেকে কাগজ মোড়া বোতলটা পড়ে ভেঙ্গে যায়, ছড়িয়ে পড়ে অ্যান্টিসেপটিক ওষুধের তীব্র গন্ধ। বাঁ হাত দিয়ে সে আঘাত ঠেকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, ডান হাতটি কোটের পকেট থেকে বার করে না। পাশ ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পকেটে ভরা ডান হাতটা মেয়েদের প্রথম বেঞ্চ আর ট্রামের সাইডের কোণের দিকে আড়াল করে রেখে এক হাতে যতটুকু পারে ঠেকিয়ে মার খাবার ইচ্ছাটা তার অদ্ভুত মনে হয়। মুখে সে প্রতিবাদ করে যায় অবিরাম। নাক আর মুখ থেকে যখন রক্ত বার হতে থাকে তখনও। কাছে গিয়ে তাকে মারতে না পেরে একটি ছেলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাতের লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দেয়, কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসে।

মারমুখো মানুষগুলিকে তখন শান্তাই থামিয়ে দেয়। আর মারতে সে বারণ করে সবাইকে, চেঁচিয়ে বলে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ছেড়ে দিন! কিন্তু কথা তার কাণে তোলো না কেউ। লোকটাকে একবার মেয়েদের বেঞ্চের ওপর পড়ে যাবার উপক্রম করতে দেখে শান্তা জোর করে কয়েকজনকে ঠেলে দিয়ে তাকে খানিকটা আড়াল করে দাঁড়ায়। তখন মার বন্ধ হয়।

ট্রাম আবার চলতে আরম্ভ করে। দেখা যায়, মেয়েদের ছুটি বেঞ্চিই খালি, হাঙ্গামার সূত্রপাতে চারজন ভদ্রমহিলাই ভয় পেয়ে নেমে গেছেন। চাদর গায়ে মাঝবয়সী সেই ভদ্রলোকটিকেও গাড়ীতে দেখা যায় না। তার অন্তর্দ্ধান অবশ্য কারো খেয়ালে আসে না। শান্তা বসে। অন্য বেঞ্চে বসে দু'জন পুরুষ। অপরাধী লোকটি সেইখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে রুমাল বার করে মুখের রক্ত মুছতে থাকে, এদিক ওদিক থেকে তার কাছে ছিটকে আসে টিটকারী আর মন্তব্য। সামনের সিট থেকে অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়, শান্তাকেও দেখে নেয়। তিনটি বন্ধু, এক আপিসেরই কেরাণী হবে তারা তিনজন, আড়চোখে শান্তার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন বলাবলি আর হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে।

ট্রাম চলে। দু'চার জন নামে, দু'চার জন ওঠে। দাঁড়িয়ে যারা বসবার জন্য ওৎ পেতে ছিল তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র ঠেলেঠুলে বসে পড়ে—হয়তো শুধু দু'তিন মিনিটের জন্যই, আপিস-ক্লান্ত দেহে একটু বসেই যেন টিকিটের দাম উসুল করে আর ন্যায্য অধিকার আদায় করে আনন্দ লাভ করতে চায়। তারপর লোক নামে বেশী, ওঠে কম। গাড়ীতে ভিড় কমতে কমতে শেষে বসবার লোকের অভাবে দু'চারটে সিট খালি পড়ে থাকে। একটা পার্ক পেরিয়ে যায়। মঠ এগিয়ে আসে। শান্তা উঠে ঘণ্টা বাজাতে হাত বাড়িয়ে অভাবনীয় আঘাত পেয়ে থ' বনে যায়।

এত মার খেয়ে আর এত লজ্জা পেয়েও লোকটা এ গাড়ী থেকে প্রথম সুযোগেই নেমে পালিয়ে যায় নি। পিছনের লম্বা বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসে সে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। ডান হাতটা বার করেছে পকেট থেকে, হাতের কব্জি থেকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত মোটা ব্যাণ্ডেজে

মোড়া। ওর বাঁ হাতে ওষুধের বোতল ছিল, হাতটা ছিল রডে ঠেকানো। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা ছিল কোটের পকেটে। কি সর্বনাশ!

শান্তার হয়ে কণ্ডাক্টর ঘণ্টা মারে। কলের পুতুলের মত শান্তা নেমে যায়। মনে তার পড়ে যায় তারই সেজমামার কথা, সাত আটবছর যার কোন খোঁজখবর সে রাখে না। ট্রামের সেই চাদর গায়ে বিষণ্ণ-গম্ভীর মাঝবয়সী ভদ্রলোকের মত ছিল তার সেজমামার বাইরের রূপ। ধীর স্থির ভদ্র, জীবনসংগ্রামে আহত শান্ত যোদ্ধার মত। কিন্তু কি বিকৃত ছিল তার মন, কি বজ্জাত সে ছিল!

মাটির সঙ্গেই শান্তা মিশিয়ে যেত, যদি অবশ্য কিছু মার খাবার পর একগাড়ী লোকের সামনে নিজের নির্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে মানুষটা শান্তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। কেন সে তা করেনি শান্তা ভেবে পায় না। হয়তো খেয়াল হয় নি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। হয় তো ভেবেছিল, ওই অন্ধ উচ্ছ্বসিত উত্তেজনার সময় মানুষের সামনে যুক্তি তর্ক হাজির করা বৃথা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা প্রমাণস্বরূপ সামনে ধরলে কেউ ধরে মুচড়ে দিতে পারে, এ ভয়টাও হয়তো ছিল। কারণ যাই থাক, ওরকম বিপদ ঘটেনি বলে, সকলের কাছে তাকে মরতে হয়নি বলে, লজ্জা আর অনুশোচনার সঙ্গে (মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার মত না হোক লজ্জা তার খুব তীব্রই হয়েছে) পরিত্রাণের, বেঁচে যাবার, স্বস্তিও সে অনুভব করে।

সব শুনে অনুপমা বলে, মাগো! কি গোঁয়ার মেয়েই তুই ছিলি! আমি হলে—

গত কালও এ প্রশংসায় শান্তা গর্ব বোধ করত। তার কাণ্ড কল্পনা

করেই অনুপমার মুখে মেয়েলিপনার সঞ্চার দেখে মনটা তার বিরক্তিতে ভরে যায়।

শোভা বলে, ছিছি! ছেলেটার জন্যে এমন মায়া হচ্ছে ভাই!

মায়া? তার কি মায়া হয় নি? ভুল করেছে বুঝার আগেই তো মায়া হয়েছিল তার, সেই তো থামিয়ে দিয়েছিল সকলকে, নইলে আরও মার খেয়ে মরে যেতনা লোকটা? এরা তাকে মায়া করতে শেখাচ্ছে!

মাধবী বলে, ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল তোর, যখন জানতে পারলি ও বেচারার কোন দোষ ছিল না।

ক্ষমা? ক্ষমা কি চাওয়া যেত? উচিত হত ক্ষমা চাওয়া? আগেও সে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভেবেছে, বাড়ী ফিরে আবার কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে। বন্ধুদের ব্যাপারটা বলে, ওদের সঙ্গে আলোচনা করে মনটা হাল্কা করার জন্য আপিসের কাপড় বদলেই অধীর আগ্রহে সে ছুটে গিয়েছিল ওদের কাছে। কিন্তু ওরা যেন আরও বিগড়ে দিয়েছে তার মনটা, তার ভুলটাকে তালগোল পাকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছে মস্ত বড় অমার্জনীয় অপরাধে। ভুল সে করেছে বিশ্রী, অতি শোচনীয় হয়েছে তার ভুলটা, তা কি সে অস্বীকার করছে? তবু ভুল তো ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভুল যখন হয়ে গেছে, উপায় কি! ওদের কাছে না গিয়ে সুধীর বা অশোকের সঙ্গে আলোচনা করলে ভাল হত। ওরা পুরুষ মানুষ, ব্যাপারটা ঠিক ভাবে নিতে পারত ওরা, এমন করে তাকে দমিয়ে দিত না।

মাধবীর সখের চাকরী, অনু আর শোভা কিছুই করে না, দরকারও নেই। তার চাকরী প্রয়োজনের খাতিরে, বাপের আয়ে সংসার চলে না. ওরা তাকে মনে মনে অবজ্ঞা করে। মাধবীর চাকরী করায় আদর্শ,

গর্ব, গৌরব সব আছে, কিন্তু তার চাকরী করার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, দরকারের জন্য, অভাবের জন্য বাধ্য হয়ে চাকরী করাতে বাহাদুরি কি আছে কোন মেয়ের? মেয়েদের সম্মান রক্ষার রোখটাও তার নিছক গোয়াতু´মি, পাগলামি।

কিন্তু ক্ষমা চাওয়া? দোষ করে ক্ষমা চাইতে শান্তা কখনো দ্বিধা করে নি। এ ক্ষেত্রে কি সে নিয়ম খাটে? অত কাণ্ডের পর অজানা অচেনা একটা মানুষকে কি বলা যেত আমায় ক্ষমা করুন, আমি ভুল করেছি? সেটা কি ব্যঙ্গের মত শোনাত না? ন্যাকামির মত? তা ছাড়া, যেরকম রুক্ষ কঠোর উদ্ধত চেহারা ছেলেটার, মনের অবস্থাও যেরকম থাকা খুব স্বাভাবিক ছিল তার পক্ষে, ক্ষমা চাইলে রাগের মাথায় যদি কিছু বলে বসত, করে বসত? বিনা দোষে অত মার খেয়ে, ওরকম লাঞ্ছনা আর অপমান পেয়ে, ক্ষমা চাইলেই সব ভুলে ক্ষমা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব?

রাত্রে ঘুমিয়ে শান্তা স্বপ্ন ছাখে, হু হু করে ট্রাম চলেছে মাঠের মধ্যে, ট্রামের ভেতরে বাইরে অন্ধকার। মাধবী, অনু আর শোভা ছাড়া আর কেউ নেই গাড়ীতে। তার সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। তাকে নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ট্রামের ঝাকুনিতে গড়িয়ে গড়িয়ে সে দরজার দিকে চলতে থাকে, চীৎকার করে ওদের ডাকতে গিয়ে গলায় আওয়াজ হয় না, সরতে সরতে দরজা দিয়ে গড়িয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে সে পড়ে যাবার উপক্রম করে। একটা উৎকট আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

·

রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ার জন্য পরদিন হৃদয় মন একটু ভোঁতা

থাকায় ঘটনাটা পিছিয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশী দূর অতীতে, গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। বাপ মা ভাইবোনের টানাটানির সংসারের বাস্তবতা আজ তার বড় ভাল লাগে। আপিসে যেতে পথে সাথী পায় পছন্দসই পুরাণো একজন চেনা মানুষকে, অনেকদিন যার সঙ্গে দেখা হয় নি। আপিসে সময়টা কাটে ভাল। আপিসের একটি মেয়ে বলা মাত্র রাজী হয়ে তার সঙ্গে সিনেমা দেখে রাত করে বাড়ী ফেরে—বেশ ঘুম হয় রাত্রে।

এমনি সাধারণ ভাবে দিনগুলি তার কেটে যেতে থাকলে ট্রামের ঘটনাটা অল্পদিনের মধ্যেই তার স্মৃতির যাদুঘরে চলে যেত, একটা বিশেষ স্থান পেত, এইমাত্র। কিন্তু পরদিন থেকে ঘটনাটির জের চলতে থাকে দিনের পর দিন—জের টেনে চলতে থাকে দেহ মনে আহত ও লাঞ্ছিত অপর পক্ষ।

বিকালে আপিস থেকে বেরিয়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, যে ট্রামটা আসছে তাতে লেডিজ্ সিট একটা খালি থাকবে কিনা ভাবছে, কোথা থেকে সে এসে হু'হাত তফাতে দাঁড়াল প্রতীক্ষারত কয়েকজনের মধ্যে, তার দিকে না তাকিয়ে। ডান হাতটি তেমনি ভাবে পকেটে ঢোকানো। মাথায় সরু এক ফালি বাড়তি ব্যাণ্ডেজ! সেদিন ট্রামে মার খাবার চিহ্ন!

ট্রামে একটা লেডিজ সিট খালি ছিল, শান্তা উঠলনা। দাঁড়াবার যায়গা ছিল, সেও উঠলনা। পরের ট্রামে শান্তার সঙ্গে সেও উঠল, শান্তার পর আরও হু'জন পুরুষ যাত্রীর পিছনে। একটি এ্যাংলো মেয়ে নেমে যাওয়া পর্যন্ত শান্তা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, হু'তিনজন যাত্রীর ব্যবধান সে

কমাবার চেষ্টা করল না, শান্তাকে আশ্চর্য ও খানিকটা নিশ্চিন্ত করে। প্রতিমুহূর্তে শান্তা অপেক্ষা করছিল সে তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াবে আর কোন রকম একটা প্রতিশোধ নেবে সেদিনকার লাঞ্ছনার। এ রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যে লোকটি ট্রাম ষ্টপেজে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, শান্তার তাতে সন্দেহ ছিল না। ওর মতলবটা কি না জানা থাকায় অজানা আতঙ্কে তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। কিন্তু সে কিছুই করল না। গাড়ীর ভিড় কমে গেলে সামনের সিটে বসা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটি বার করে জানালায় রাখা আর শান্তার পিছু পিছু ট্রাম থেকে নামাকে যদি কিছু না করা বলা যায়।

পিছু পিছু বাড়ী পর্যন্ত যাবে সন্দেহ নেই। এবার শান্তা ওর মতলবটা টের পায়। তার বাড়ীটা চিনবার জন্য ও আজ তার সঙ্গে নিয়েছে। ট্রামে এত লোকের মধ্যে কিছু করা তো সম্ভব নয়, আজ বাড়ী চিনে রাখছে, সুযোগ সুবিধামত একদিন শোধ নেবে। একটু এগিয়েই বাঁয়ে শান্তার বাড়ীর রাস্তার মোড়। মোড় ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে সে দেখতে পায়, লোকটি তার পিছু নেয় নি, ট্রাম ষ্টপেজেই দাঁড়িয়ে আছে। ভয় ভাবনা অস্বস্তি নিয়ে শান্তা বাড়ী ঢোকে, সেদিন আর বাইরে যায় না। বাড়ীতে কিছু বলবে কি বলবে না ঠিক করতে করতে আর বলা হয় না। বাড়ীর লোক বড় হৈ চৈ করে সামান্য বিষয় নিয়ে।

পরদিন আপিস যাওয়ার সময় দেখা যায়, যুবকটি ট্রাম ষ্টপজে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সে একা নয়, সঙ্গে একজন সমবয়সী যুবক, সুশ্রী চেহারা, পরিচ্ছন্ন বেশ, কাঁধে দামী শাল। আপিস টাইমে এখানেও ভিড় হয়, যদিও ডিপোটা হাতের কাছেই। শান্তার পিছনে ওরা ওঠে,

শান্তার লেডিজ সিট পেরিয়ে সামনের দুটো বেঞ্চ পরে বসে। মাথা নীচু করে দু'জনে তারা কথা বলে, ছেলেটির সঙ্গী মুখ ফিরিয়ে প্রায় বিস্ফারিত চোখে শান্তার দিকে তাকায়, আবার গভীর আগ্রহে তার কথা শোনে, আবার তাকায়। শান্তার সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে বিছা আর আর্সুলা।

ফিরবার সময় সে একাই সঙ্গে আসে। পরদিনও সঙ্গে যায় এবং আসে একাই। পরদিন যাবার সময় লোকটির সঙ্গে থাকে সুন্দরী এক তরুণী। সামনের শেষ বেঞ্চ দু'জনে বসে, তরুণী কথা শোনে লোকটির, কথা বলতে বলতে আঙুল দিয়ে লোকটি শান্তাকে দেখিয়ে দেয়—অকারণেই দেয়, কারণ গাড়ীতে তখনো আর কোন মেয়ে ওঠেনি —তরুণী বিস্ফারিত চোখে তাকায় শান্তার দিকে, লোকটির কথা শোনে, আবার তাকায়। একটা আর্তনাদ ঠেকে থাকে শান্তার গলায়, ঢোঁক গিলতে পারে না। মাথা ঝিম ঝিম করে।

এমনি চলতে থাকে দিনের পর দিন। লোকটির মাথার ব্যাণ্ডেজ অদৃশ্য হয়, ডান হাতে ব্যাণ্ডেজের বদলে আসে পাতলা চামড়ার তেলতেলা দস্তানা। কখনো একা, কোনদিন একজন, কোনদিন দু'তিনজন সঙ্গী নিয়ে সে শান্তার সঙ্গে ট্রামে যাতায়াত করে। সঙ্গী থাকলে তারা গল্প শোনে আর শান্তাকে ন্যাখে। ট্রামে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে তাকেও সে গল্প শোনায়, সেও তাকায়। বাদ যায় দু'এক বেলা, দু একদিন। শান্তার যেন জ্বর ছাড়ে। তার আশা জাগে, এবার হয়তো লোকটির সাধ মিটেছে, বিরক্তি জেগেছে এই একঘেয়ে নিষ্ঠুর খেলায়, মন গিয়েছে নিজের কাজে, এবার সে রেহাই পেল। কিন্তু আশা তার টেঁকে না।

ট্রাম ছেড়ে শান্তা বাস ধরে —খানিক হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। ঠিক দুদিন পরে বাসে তাকে দেখা যায়। আগে বোধ হয় সে বাসেই যাতায়াত করত, কারণ একা শান্তার সঙ্গে বাসে উঠলেও চার পাঁচজন পরিচিত লোককে সে শান্তাকে দেখিয়ে গল্প শোনায়।

ওর নামটা শান্তা জেনেছে—অমূল্য। ট্রামে পরিচিত লোক ওকে দেখে ডেকে বলেছে : আরে অমূল্য যে! অনেক তফাৎ থেকেই হয়তো বলেছে কিন্তু খানিক পরেই অমূল্য ভিড় ঠেলে হাজির হয়েছে তার কাছে, কানে কানে বলেছে তার চিরন্তন কাহিনী।

কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই। কোন অভদ্রতাই সে করে না। তার চেনাশোনা লোক, যাদের সে শান্তার বাহাদুরীর গল্প শোনায়, তারা ছাড়া ট্রামের অন্য কোন আরোহী বোধ হয় টেরও পায় না কি ভয়ঙ্কর ভাবেই সে উৎপীড়ন করছে গাড়ীর একটি অসহায় মেয়েকে।

শান্তা প্রাণপণে চেষ্টা করে অমূল্যকে তুচ্ছ করতে, অগ্রাহ্য করতে। ধার করে ভাল শাড়ী পরে, প্রসাধনে বেশী মন দেয়, ট্রামে হয় বই পড়ায় ডুবে থাকার নয় নির্বিকার ভাবে বাইরে তাকানোর ভাণ করে। কিন্তু অমূল্যর আক্রমণ তো বাইরে নয়, একেবারে মনের ওপর। এ আক্রমণের বিরুদ্ধে সে কেন আত্মরক্ষা করতে পারবে। তার নিজের ভুল, তার নিজের অন্যায়ের গুরুত্ব অমূল্য তার কাছেই দিনের পর দিন বাড়িয়ে দিতে থাকে।

এমন সৃষ্টিছাড়া রাগ আর প্রতিহিংসা সহজে জাগে কারো মধ্যে? নিজের শত অসুবিধা তুচ্ছ করে এতকাল কেউ কি এমনভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে যেতে পারে সামান্য কারণে? কতবড় ঘা খেলে মানুষের মন এভাবে বিগড়ে যায়, জীবন পণ করে এভাবে চালিয়ে যায়

প্রতিঘাতের সাধনা, ভাবলেও মাথা ঘুরে যায় শান্তার। একদিনের খেয়ালে, একদিনের গোয়ার্তুমিতে একটা মানুষকে সে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। এতবড় অপকাজকে ভুল বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? সব দোষ তার। অমূল্য যদি আজ প্রকাশ্যে তার গালে চড় কষিয়ে দিয়ে তার অমার্জনীয় অপরাধের কথা সকলকে শোনায়, মুখ বুজে তাকে সে শাস্তি মেনে নিতে হবে। প্রসাধন ভেদ করে শান্তার মুখের বিবর্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বারবার বইয়ের পাতা থেকে বা বাইরের রাজপথ থেকে তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি অমুল্যের দিকে গিয়ে পড়ে। মাথা তার ঝিম ঝিম করে আসে।

সপ্তাহ পাঁচেক পরে একদিন তারা দু'জন সামনে পিছনে জানালা ঘেঁসে বসে ট্রামে চলেছে, দ্বিতীয়বার ট্রাম থামতে উঠলেন ডাক্তারি কালো ব্যাগ হাতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আঁটা প্যাণ্ট ও ঢিলে কোট পরা। শান্তাকে পেরিয়ে যেতে গিয়ে থামলেন, পিছনের তিনজন অগ্রগামী যাত্রীকে ঠেকিয়ে রেখে।

আপিস যাচ্ছিস্ বুঝি?

হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই। আপনি ট্রামে?

পেট্রোল নেই। তোর জেঠিমা কাল সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর করে বেড়াল। কি করি, ট্রামে চেপেই রোগী দেখছি। তোর চেহারা এত খারাপ কেনরে? অসুখ নাকি?

না। এমনি।

পিছনের যাত্রীর তাগিদে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকই অমুল্যের পাশে বসেন।

বলেন, অমূল্য যে! কি খবর? কেমন আছ?

শান্তার বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে। ডাক্তার জ্যাঠামশাই অমূল্যর চেনা মানুষ?

অমূল্য বলে, ভালই আছি।

শান্তা পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এই মানুষটি চিরদিন তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এসেছেন। অমূল্যর কাছে তার বীভৎস আচরণের বর্ণনা শুনে না জানি কি মনে করবেন! অমূল্যর কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার জ্যাঠামশায়ের মাথাটা তার দিকে ঝুঁকে গেলে শান্তার চোখ ফেটে জল আসে। ডাক্তার জ্যাঠামশায় মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে সে দুহাতে মুখ ঢেকে সামনের সিটের ওপর মুখ নামিয়ে রাখে।

সন্ধ্যার পর কেদার ডাক্তার তাদের বাড়ী আসেন, তেমনি আঁটো প্যাণ্ট আর ঢিলে কোট পরে। তিনি ব্যস্ত মানুষ, কদাচিৎ বাড়ীতে তাঁর এরকম অযাচিত পদার্পণ ঘটে। বাড়ীতে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। শান্তা জানে ডাক্তার জ্যাঠা কেন এসেছেন, বাড়ীর সবাইকে তার অপকর্মের কথা শোনাতে আর তাকে তিরস্কার করতে। শোবার ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। টেবিলের কোণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ভেতরটা কেমন উলটে পালটে পাক খেয়ে বেড়াতে থাকে। কেদার ডাক্তার ডাকতেই দরজা খুলে দেয়, কেদারের পায়ে তার হাত যেন আর্তনাদ করে ওঠে, আর কখ্খনো আমি এমন করব না ডাক্তার জ্যাঠা, কখ্খনো করব না।

কেদার বলেন, হুঁ। তা ওরকম কর না কর সেটা তোমার খুসী। আমি শুনতে এলাম, ও ছোঁড়াটা কি গুণ্ডামি করছে। কি সব বলল ভাল বুঝতে পারলাম না।

পরদিন থেকে অমূল্য আর জ্বালাতন করে না শান্তাকে। তার জীবন থেকে সে একেবারে সরে যায় চিরদিনের জন্য। কয়েকদিন পরে স্বাক্ষরহীন একটা চিঠি পায় শান্তা।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ছেলেবেলা থেকে আমি একরোখা গোঁয়ার। কোন রকম অন্যায় আমার সয়না। কিন্তু আপনার ভুলটা যে অন্যায় নয়, এটা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। ট্রামে একজন আপনাকে অপমান করেছিল সত্যই, আপনি ভুল করে ভেবেছিলেন আমিই সেই পাষণ্ড। আমি আগে বুঝিনি, এরকম শত শত ভুল হওয়া ভাল, মেয়েরা যদি নিজেদের সম্মান বাঁচাতে আপনার মত রুখে দাঁড়ান। আপনার কাজ ভুলই বা বলি কি করে। আমিও দোষী বৈকি। গুণ্ডারা মেয়েদের পথে ঘাটে অপমান করছে জানি, তবু যদি আমি আমার দু'এক হাতের মধ্যে আমার কোন মা বোনের লাঞ্ছনা জুটছে কিনা খেয়াল না রাখি, আমিও দোষী হব বৈকি। আপনি ঠিকই করেছিলেন, আমিই ভুল করেছি। মেয়েদের সম্মান রাখার দায়িত্ব আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

অনেক অসভ্যতা করেছি। ক্ষমা করবেন।—

শান্তার উৎসুক চোখ ট্রামের এদিক ওদিক অমূল্যকে খোঁজে আজও। দেখা হলে একবার সে তাকে জানিয়ে দিত, মেয়েদের মান মেয়েরাই রাখতে জানে। পথে ঘাটে দু' দশটা রুগ্ন বিকারগ্রস্ত ইয়ার্কি টিটকারী দিয়ে বা ভিড়ের মধ্যে খাবলা দিয়ে মেয়েদের মান কেড়ে নিতে পারে না। মানটা মেয়েদের গায়ের গয়না নয়, শুধু গায়েই থাকে না।

কানাই তাঁতি

বিয়ের জন্য অনেক কষ্টে অনেক দিনের চেষ্টায় কানাই তাঁতি দু'কুড়ি তিন টাকা জমিয়েছিল। পিছনে ছিল বুড়ী মায়ের তাগিদ। রাঁধাবাড়া মাজাঘষা ঘর কন্নার অবসরে কাঁচাপাকা রুক্ষু জটবাঁধা চুলের অরণ্য থেকে উকুন বেছে বেছে নখে নখে পিষে টুক্ টুক্ মারতে মারতে বুড়ী রোজ তাকে খুঁচিয়ে এসেছে বিয়ের জন্য টাকা জমাতে। যোয়ান ছেলে এমনি যদি টাকার মায়া নাও করে, বিয়ের জন্য সে টাকা জমায় উৎসাহের সঙ্গে, কষ্ট সয়, ধৈর্য্য ধরে। ছেলে বিয়ে করে বৌ ঘরে আনলে সে আবাগীর বেটি হয় তো উড়ে এসে জুড়ে বসবে ঘর দোর, কানাই হয় তো তখন আর নজর দেবে না মায়ের দিকে, ফেলনা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে তাকে অনাদর অবহেলার অন্ন খেয়ে। তবু যত তাড়াতাড়ি পারে ছেলেটাকে বিয়ে করাতে বুড়ী পাগল। রাঁধতে বাড়তে বাসন মাজতে জল তুলতে মাড় যোগাতে আর সে পারে না। কোমর ভেঙ্গে আসে তার। বড় সড় বৌ এসে রাজত্বি করুক তার সংসারে, তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিক—হারু তাঁতির বৌটা যেমন দেয় তার শাউড়ীকে, ঘরকন্নার সব কাজ সে করবে, তাঁতের কাজের হাজার খুঁটিনাটি সাহায্য যা দরকার হয় তাঁত সাজিয়ে বোনা আরম্ভ করা পর্য্যন্ত কানাই-এর, সে সব সাহায্যও

করবে। বড় সড় বৌ আন্‌তে টাকা লাগে বেশী। কানাই টাকা জমাক। প্রাণপণে টাকা জমাক।

গোবরার মেয়েটা, উই যে ফুলি গো, এক কুড়িতে নাকি গোবরা রাজী আছে শুনলাম, যে দেয় সে দেয়।

রামো! থুঃ! বুড়ী নাক সিটকায়, বয়সডা কি মেয়ার? কাইল না ন্যাংটা হইয়া ঘুরছে? বিয়া কইরা থুবি, চার পাঁচ সন ঘর করবনা। কাম কি অমন বৌ দিয়া? কচি বৌ তাগো পোষায়, ঘরে যাগো তুইটা একটা যুয়ান মাইয়ালোক আছে। তর নি এই বুড়া মাডা সম্বল, এক বেলা রাঁইধা না দিলে খাওন জোটে না। নারে সোনা নারে মাণিক, ওই কাম কইরো না। ডাগর বৌ আনবা।

ডাগর বৌ দরকার কানাই-এর, বড় সড় সমর্থ বৌ, যে খাটতে পারবে, বুড়ীকে রেহাই দেবে।

বুড়ী উকুণ বাছে, উকুণ মারে। বলে, গেঁয়াতি ভোজ দিয়া কণ্ঠি বদল কর না ক্যান মাতির লগে? যা করুক তা করুক, মাইয়াডা ভাল, খাটুইনা মাইয়া।

তিনকুড়ি টাকা চায় মাতির বাপ। কানাই বলে ঝাঁঝের সঙ্গে, আপশোষের সঙ্গে। তার রাগ দেখে বুড়ী মা ভাবে, ব্যাপারখানা কি? একটা মেয়ের বাপ বেশী টাকা পণ চায় বলে এত বেশী গোসা করে তার ছেলে, এর মধ্যে কিছু আছে গোলমাল। সে কথা তোলে না বুড়ী, মুখে শুধু বলে, মরে না বুড়া, অপঘাতে মরে না?

তুকুড়ি তিন টাকা, কতদিনে তিনকুড়ি করতে পারবে জানে না কানাই। সবগুলি রূপার টাকা, টুং টুং মধুর আওয়াজ দেয়। মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় সে আওয়াজে। বৌ-কেনা টাকা, এক লা একলা

খেটে খেটে মরে যাওয়ার বিচ্ছিরি লাগা দিনগুলি শেষ করার টাকা! খাড়ুর লম্বা থলিতে ভরে এক আনায় কেনা টিনের কৌটাটার মধ্যে রেখে বিছানার নীচে মাটির গর্ত্তে লুকিয়ে রাখা রূপার রূপ ধরা অনেক দিনের তপস্যা। মাতিকে পেতে হলে তার কতগুলি টাকা দরকার? পুরো এক কুড়িও নয়। তিন কম এক কুড়ি। কিন্তু আরো কতকাল না জানি কেটে যাবে তার ও টাকাটা জমাতে। তাতেও কি হবে শেষ পর্য্যন্ত? জ্ঞাতি ভোজের টাকা চাই, এটা ওটা কেনাকাটায় টাকা চাই আরও কয়েকটা। ততদিন কি আর তার জন্য বসে থাকবে মাতি? রসিক কি মেয়েকে ধরে রাখবে কবে সে কণ্ঠি বদলের যোগাড় করে উঠতে পারবে সেই ভরসায়? একটানা একটা ভয় বুকে পুষে রেখেছে কানাই, কে জানে কবে কে ছিনিয়ে নিয়ে যায় মাতিকে, রসিককে তিন কুড়ি টাকা দিয়ে, জ্ঞাতি ভোজন করিয়ে, কণ্ঠিবদল করে। বোঁচাকেই তার ভয় বেশী। বজ্জাত বোঁচা। তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টায় সহরে দাঁও মেরে এসে এবার তার মাতিকে দাঁও মারবার চেষ্টায় আছে। তাঁত বুনে কানাই-এর সঙ্গে তো পাল্লা দিতে পারবে না, শহর থেকে চুরি চামারি করে পয়সা এনেছে।

শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ আকাশে ভেসে যায় অজানা দেশের দিকে, খটাখট তাঁত চালিয়ে যায় কানাই, ছুটোছুটি করে এধার থেকে ওধারে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটেছে এই স্নিগ্ধ শীতল মধুর বিকালে। পড়তা রাখতেই প্রাণান্ত। আট মাসে আর একটা টাকাও জমা হয় নি কানাই-এর টিনের কৌটায় খাড়ুর থলির দু'কুড়ি তিন টাকার ভাণ্ডারে। দিনের আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাঁত চালাতে পারবে কানাই। তারপর সব অন্ধকার। দীপটি জ্বালা বে-আইনী, বলে গেছে কেষ্ট চৌকিদার।

সারাদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে খেটে কে আর তাঁত চালায় সন্ধ্যার পর? ক্ষমতায় কুলোবে কার? তবু আফশোষ জাগে কানাই-এর মনে। খুসী যদি হয় তার সে কেন পারবে না আলো জ্বেলে রাতে তাঁত চালাতে, মুখে রক্ত যদি ওঠে, তবু?

কাঁসার এক আফফোরা হাতে নিয়ে আসে মাতি।

বাবা কইলো, বাঁধা রাইখা তিনডা টাকা দিবা?

পোয়া মাপা আফফোরা, এক টাকা কি বড় জোর পাঁচ সিকের বেশী দাম হবে না।

কাপড়টা ছেঁড়া মাতির, মিলের মোটা কাপড়। তাঁতির মেয়ের গায়ে মিলের কাপড়! কোমরের বাঁক স্পষ্ট, বুকের ভাঁজ উদলা। তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

তিন টাকা দেওন যায় না।

ক্যান? অন্যে তো দিচ্ছে।

বোঁচা বুঝি দেয়? এক টাকা পাঁচসিকের আফফোরা বাঁধা রেখে তিনটা টাকা আনতে মেয়েকে পাঠিয়েছে রসিক তার কাছে, যে মেয়ের জন্য সে জমাচ্ছে তিন কুড়ি টাকা, যদ্দিন চন্দ্রসূর্য্য উঠছে তদ্দিন।

দেয়। সহরে গেছে না?

সহরে গিয়া আন গা, আমি দিমু না। কই পামু টাকা? আমি নি মহাজন?

দিবা। তুমিই দিবা। মাতি বলে মুখ উঁচু করে তাঁত ঘরের ফুটো চালার দিকে চেয়ে। অনেকগুলি ফুটো দিয়ে আলো আসছিল পড়ন্ত সূর্য্যের।

তাঁত থেকে উঠে আসে কানাই। মাতির হাত ধরে।

বিয়া করবা ? কও বিয়া করবা ? তাঁত ঘরের নির্জ্জনতায় মাতি যেন নাগিনীর মত ফুঁসে ফুঁসে কাঁদে।

বিয়া করুম। তরেই আমি বিয়া করুম মাতি। কানাই বলে বেপরোয়া হয়ে। মাতির বাপকেই যে কড়করে নগদ তিনকুড়ি টাকা দিতে হবে, তার মধ্যে মোটে দু'কুড়ি তিন টাকা তার সম্বল, এসব কথা সে ভুলে যায়।

পরদিন মাতি আবার আসে দুপুর বেলা, ঘর্মাক্ত কলেবরে কানাই যখন তাঁত চালাচ্ছে। বুড়ীর সঙ্গে আগে সে কথা বলে সুখদুঃখের—সে যেন এ বাড়ীরই একজন সে আপন মানুষ এমনি ভাবে। তাঁত ঘরে কাল অযথা অনেকক্ষণ ছিল বুড়ীর ছেলের সঙ্গে—বুড়ী তা জানে বৈ কি, নিশ্চয় জানে। জানবে না কেন, জানুক। এতে তো আর ফাঁকি কিছু নেই, চালবাজী নেই। যা সত্য, যা যথার্থ,—আজ নয় কাল নয় শুধু, যা জীবনের আগামী বছরগুলির জন্য নিশ্চয় বলে মানা হয়েছে মরণ পর্য্যন্ত তা নিয়ে দাবাচালী কাণ্ড করুক বুদ্ধির দাস ভদ্দর লোকেরা, সে বাবা অতশত প্যাঁচের ধার ধারে না। তার দরকার কি। আপন যাদের মানা হল তারা আপন।

গলায় দড়ি দিছে যদুর বৌডা।

সইবার পারল না করব কি কও ?

সইবার পারলনা ক্যান ? যুয়ান মাগী তো, নাকি ব্যারামে বুড়াইছে ? মরণ ঘ্যান সস্তা, গলায় দড়ি দিছে। ভদ্দর ঘরের মাইয়া যেন হারামজাদি, ভদ্দর ঘরের বৌ। বাঁইচা থাইকা প্রাণভয়ে বাঁচনের লাইগা মরণে দোষতা কি ? মরণ মরণই না আর কিছু। না মইরা বাঁচে কেডা ? মরুম যদি মরণ যখন তখন মরুম, বাঁচুম যখন ক্যান মরুম, গলায় দড়ি

দিয়া, নিজেরে খুন কইরা? যুয়ান মাইয়া, পুরুষকে যৈবন দিয়া নয় বাঁচতো!

রামো রামো, থুঃ। বুড়ী শিউরে ওঠে।

ক্যান? ফুঁসে ওঠে মাতি, ভাবী শাশুড়ীর অবজ্ঞায়, য্যামনে পারি বাঁচনটা তুচ্ছ না? কষ্ট পাইলাম, গলায় দড়ি দিলাম, সেইডা ভাল, না?

রগে রগে টান লাগে বুড়ীর, গা অস্থির অস্থির করে। কথাটার এদিকটা সে এড়িয়ে যেতে চায়, একেবারে নতুন কথা বলে,—কিন্তু তার নতুন কথাতেও বাজে সেই পুরাণো একটানা বাঁচন-মরণের সমস্যা। বুড়ী বলে, আমি কই কি, ভাতারে ভাত দিবো। ভাতারের যদি মরণ নিষ্যস বৌরে ভাত দিবার লাইগা, বৌ কইব ভাত চাই না। গলায় দড়ি দিব বৌ।

না, গলায় দড়ি দিবনা। ক্যান দিব? বৌরে ভাত দিবার লাইগা মরণ নিষ্যস করল যে ভাতার, তারে বাঁচানের লাইগা বৌ বাঁইচা থাকব। ভাত আইনা বাঁচাইবো ভাতাররে।

রাগে বুড়ীর দম আটকে আসে। বেহুলা সোয়ামীরে বাঁচিয়েছিল সাপের বিষ থেকে, দুদণ্ড একটু ঝাঁড় ফুঁক করে, সামান্য একটা পেশাদার ওস্তাদ যা পারে। বিয়ার যুগ্যি এই যুয়ান মাগী বিয়ার আগে কয় যে না খেয়ে উপোস দিয়ে ভাতারকে বৌ মারতে দেবেনা, নিজেও মরবে না। খুসী যেন নিজের!

তিন কুড়ি ট্যাহা দিয়া তবে না বেচবো তরে বাপ? যারে পায় তারে?

বেচবো। যারে পায় তারে না। আমি যারে চাই তারে। বেচবো, নিশ্চয় বেচবো। খাইয়াইছে, পরাইছে, বড় করছে—

তাঁত ফেলে উঠে এসে কিছুক্ষণ থেকে কানাই দু'জনের ঝগড়া শুনছিল অবাক হয়ে, এবার সে কথা বলে।

কাক চিল তাড়াইছ দু'জনায়। অখন থামবা?

যাবার আগে তাঁতঘরে মাতি কানাইকে জিজ্ঞেস করে, বিয়ের জন্যই মোট কত টাকা সে জমিয়েছে। সোজাসুজি খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞেস করে, তার যেন জানবার অধিকারও আছে, প্রয়োজন আছে। কানাই-এর জবাব শুনে সে খুসী হয়ে ওঠে।

দু'কুড়ি তিন টাকা! কও কি?

মুখখানা তার হাসিতে ভরে যায়।

কথাটা শুধিয়েই যাবে ভেবেছিল মাতি, এবার উবু হয়ে বসে হিসাব নিকাশ পরামর্শ করে কানাই-এর সঙ্গে যে আর কতদিনে তা হলে কিসে কি হওয়া সম্ভব! কানাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে যেন কথার উচ্চারণে চালিয়ে যায় নিজের মনের জল্পনাকল্পনা।—বেশী দিন লাগবো না। লড়াই বাঁধছে, কাপড়ের দাম চড়তেছে।

সুতার দামও চড়তেছে।

মাতি কি যেন ভাবে খানিকক্ষণ আপন মনে। তারপর জোর দিয়ে বলে, এক কাম কর। ফেইলা রাইখো না টাহাটা, সুতা কিন্যা থোও!

জমান টাকায় সুতা কিনা থুমু? কানাই বলে আশ্চর্য্য হয়ে।

হ' সুতা কেনো। সুতার দর বাড়বো, কাপড়ের দরও চড়বো। কাপড় বুইনা বেশী দামে বেচবো। হাতের টাকা খাটিয়ে মূলধন বাড়াবার এই মূল নীতি আঁচ করে ফেলে বেশ যেন গর্ব্ব বোধ করে মাতি।

'দর যদি পইড়া যায়? কানাই বলে দুর্ভাবনায় ভুরু কুঁচকে।

তা বটে, একটা ভাবনার কথা। দর বাড়তে পারলে, কমতেও পারে বৈকি। সুতো কেনে, তাঁত বোনে, কাপড় বেচে, সুতো কেনার পয়সা রেখে বাড়তি পয়সা খায়, পারলে খাড়ুর থলির জমানো টাকা আরেকটা বাড়াবার চেষ্টা করে, তাঁতির কি মাথা আছে না সাহস আছে, গায়ের রক্ত জল-করা সর্ব্বস্ব পণ করে উঠতি পড়তি বাজার দর নিয়ে খেলা করার। কথাটা কিন্তু ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় কানাই-এর মাথায়, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারে না মাতির প্রস্তাবটা। যে ভাবে চলছে এভাবে চললে কতদিনে পুরো টাকাটা তার জমবে, বুক বেঁধে মাতির পরামর্শ মত যদি লাগিয়েই দেয় টাকাগুলো যা থাকে কপালে, কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো স্বপ্ন তার সফল হবে। থলি খুলে টাকাগুলি সে সস্নেহে নাড়াচাড়া করে, তার বুক কেঁপে যায়। একদিন সে পরামর্শ চাইতে যায় বুড়ো রঘু তাঁতির। তার মতলব শুনেই রঘুর চোখ কপালে উঠে যায়।

ভূত চাপছে ঘাড়ে, না? অমন কাম করিস না, খপর্দ্দার।

শিবু তার সাঙাত্। সে কিন্তু মাথা চুলকে বলে, মন্দডা কি? দেখলে পারস্।

ভাবতে ভাবতে মহিমগঞ্জের দুটো হাট চলে যায়। সুতোর দাম বাড়ে—অনেক বাড়ে। হাটে সুতো আসে কম—অনেক কম। পরের হাটবারে কানাই এক কুড়ি টাকা নিয়ে হাটে যায়। ভেবে চিন্তে সে ঠিক করেছে, সব টাকাটা না লাগিয়ে কুড়ি টাকা লাগাবে অদৃষ্ট পরীক্ষায়। টাকাগুলি নিয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়, সুতো কেনার টাকা আর বোনা কাপড়খানা বেচবার টাকা নিয়ে। হাটে পৌঁছতে তার কিছু দেরী হয়েছিল। সামান্য যে সুতো এসেছিল হাটে সে

পৌঁছবার আগেই তা বিক্রী হয়ে গেছে চড়া দামে। তবে কাপড়খানার দাম সে পেয়েছে আশাতীত। অদ্ভুতরকম বেড়ে গেছে কাপড়ের দাম, তিনকড়ি সা ঠিক দর দেয়নি তাকে, তবু একখানা কাপড় বেচে যে দেড় গুণ্ডা টাকা লাভ থাকে সে কি ভাবতে পেরেছিল কোনদিন? আগেই সব টাকার স্থতো না কেনার জন্য আপশোষ করতে করতে সে বাড়ী ফিরল।

পরের হাটে গেল শেষ কড়িটি আর শিবুকে সঙ্গে নিয়ে। যোগজীবন হাটে স্থতো এনেছে কিছু কিন্তু তার দর অসম্ভব। স্থতো মিলছে না, সামনের হাটে আরও চড়ে যাবে দর—হয়তো মিলবেই না।

মিলবে না? হতভম্ব হয়ে যায় কানাই আর শিবু।

তারপর বাস্তব হল যা ছিল ভয়ার্ত্ত রাত্রের দম আটকানো বীভৎস দুঃস্বপ্ন। এত দুঃখের জীবনেও স্বপ্ন ছিল কানাই-এর, পেট খিদেয় মোচড় দিতে থাকলে পান্তার মধুর গন্ধে জাগা স্বপ্ন, হৃদয় টন টন করতে থাকলে সঞ্চিত টাকার স্পর্শে জাগা আগামী কোন একদিন মাতিকে ঘরে আনার স্বপ্ন। সব স্বপ্ন গুঁড়ো হয়ে গেল কাঁচের মত মহাকালের বুট-পরা পায়ের চাপে, মৃত্যু ঘনিয়ে এল দুর্ভিক্ষের রূপে চাষী তাঁতি কামার কুমার তেলি জেলের ঘরে। সব বেচে দিল অসহায় মানুষ বাঁচাবার চেষ্টায়, ঘটিবাটি হালবলদ ভিটে মাটি হাঁপর হাতুড়ি তাঁত—মেয়ে বৌ পর্য্যন্ত। তবু ঠেকানো গেল না মৃত্যুকে। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মরল দলে দলে, বাঁচবার চেষ্টায় দলে দলে দিশেহারা মানুষ পালিয়ে গেল গাঁ ছেড়ে।

দাওয়ায় বসে ঝিমোয় কানাই। তাঁত না চালিয়ে বাত ধরে গেছে

খিদেয় অবসন্ন ক্ষীণ শরীরে। কেবল ভাবছে, বিছানার নীচে মাটির গর্তে লুকানো টিনের কোটায় খাড়ুর থলিতে রাখা টাকাগুলির কথা। সব গেছে কানাইএর, তাঁতটাও সে বাঁধা দিয়েছে, কিন্তু এ টাকায় হাত দেয় নি। শুধু ওই বুড়ী মা আর তার দুটো পেট বলেই এতদিন চলেছে এ ভাবে, এখন আর উপায় নেই। তাঁতটা একেবারে বেচে দিলে আরও কিছুদিন চলবে। তাই ভাবছে কানাই। তাঁতটা বেচে দেবে।

বুড়ী শাপছে তাকে, অবিরাম শাপছেঃ অখনো বিয়ার সখ, পিরীতের নেশা! মায়েরে মাইরা নিজে মইরা নরকে গিয়া বিয়া করবি, পিরীত করবি?

মাথা ঝিম ঝিম করে কানাই-এর।—বিয়া! পিরীত!

জগৎ সংসারে যেন বিয়ে পিরীত এসব আছে, এখনো ওসব ভাববার যেন তার আছে ক্ষমতা আর অবসর! মা কি বুঝবে ওই টাকাগুলিই তার টিঁকে থাকবার, বেঁচে যাবার শেষ ভরসা। কি কাণ্ড ঘটছে চারিদিকে চোখ মেলে কান পেতে সে তো দেখছে শুনছে সব। প্রতিদিন সে প্রত্যাশা করছে, একটা কিছু কি ঘটবে না, হঠাৎ কি বদলে যাবে না চারিদিকের অবস্থা? ওই টাকা সম্বল করে বাঁচতে হবে তখন তার। আজ যদি টাকাগুলি সে খরচ করে দেয় এখনকার উপোসে কাবু হয়ে, শাকপাতা কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা না করে, কাল যদি খারাপ দিন শেষ হয়ে সুদিন আসে, তবু সে তখন তলিয়ে যাবে। দুঃখের রাতে মরে না মানুষ, মরে দুঃখের রাতে সুখ চেয়ে সব খুইয়ে সুখের দিনে বাঁচবার উপায় না পেয়ে।

সর্ব্বাঙ্গে একটা আড়ষ্টতার কষ্ট। পেটে ভোঁতা একটা যন্ত্রণা।

মাথার মধ্যে পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মগজটা। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ভাবে কানাই। ভাল দিন আসবার আগেই যদি সে মরে যায়? না, মরবে না। তাঁতটা বেচবে।

কোন মতে টিকিয়ে রাখবে নিজেকে।

মাতি আসে সন্ধ্যাবেলা।

কয়ডা টাকা দিবা?

কই পামু?

সেই টাকার থেইকা দেও। পায় ধরি তোমায়। আমারে বিয়া করনের টাকা, কয়ডা দেও, দুই গণ্ডা দেও। না ত বিয়া কর আমারে। এই দণ্ডে বিয়া কর। বিয়ার টাকায় বিয়া কর। বাপটা মরুক। মাইয়ারে উপাস দিয়া রাখে, কিসের বাপ।

সেই টাকা কই? ভাইঙ্গা খাইছি সব!

ভাইঙ্গা খাইছ? অনাহারে ক্ষীণ দুর্ব্বল মাতির ঝিমানো ভোঁতা গলা শান দেওয়া তীক্ষ্ণতায় ঝন ঝন করে বেজে ওঠে, আমারে বিয়া করনের টাকা ভাইঙ্গা খাইছ? তুমি চোর! আমারে না দিয়া খাইছ? তুমি ডাকাইত।...

আর্ত্তনাদ করার মত মাতি গাল দিয়ে শাপ দিয়ে চিরে দিতে থাকে ঝিঁ ঝি ডাকা অন্ধকার।

চোরাই

ভোরে ধরা পড়ল, রাত্রে কোন এক সময়ে রান্নাঘরে চুরি হয়ে গেছে।

ধরা পড়ল পঙ্কজিনী কাছে। রোজ শেষ রাত্রে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর ঘুম আসে না। সে ঘুমকাতুরে, প্রথম রাত্রে, দশটা বাজতে হাই উঠতে আরম্ভ হয়, চোখ জড়িয়ে আসে। কেদারের কিন্তু প্রথম রাত্রে দারুণ অনিদ্রা, বারটা একটার আগে ঘুমের জন্য শোয়ার কোন বালাই নেই তার কাছে, শুয়ে শুয়ে শুধু ছটফট করা আর পঙ্কজিনীকে জাগিয়ে জাগিয়ে রাগিয়ে দেওয়া। তবে ঘুম কেদার পুষিয়ে নেয়, বেলা ন'টা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে। শেষ রাত্রে এপাশ ওপাশ করতে পঙ্কজিনী তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে সে ভীষণ রেগে যায়, পাশ ফিরে তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমিয়ে পড়ে রাগের মধ্যেই। পঙ্কজিনীর তাই জাগলে আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না, খুব ভোরে ঝি এসে কড়া নাড়লেই উঠে পড়ে। ঝিকে দরজা খুলে দেবার জন্য অবশ্য তার বিছানা ছেড়ে উঠে নীচে যাবার কোন দরকার নেই। নীচে বৈঠকখানায় শোয় সতীশ, পাশের ঘরে রাজেন শোয় তার নতুন বৌ নিয়ে, রান্নাঘরের লাগাও ছোট খুপচি কুঠরিটাতে শোয় বিশ্বম্ভর ঠাকুর। ওরা যে-কেউ দরজা খুলে দিতে

পারে। পঙ্কজিনী ওঠে নিজের গরজেই। আর ওঠে বলে রান্নাঘরের তালার চাবিটাও রাখে নিজের কাছে। রান্নাঘরের তালা খুলে দাঁত মাজার জন্য উনানের তল থেকে ঘুঁটের ছাই নেয়।

সেদিন তালা খুলতে গিয়ে দ্যাখে, শিকলটার গোড়া উপড়ানো। যা কিছু ছিল ঘরে সব চুরি হয়ে গেছে।

বিশেষ কিছু ছিল না রান্নাঘরে, দামী জিনিষ একটিও নয়। বাসন-পত্র সব রাত্রে রাজেনদের ঘরে জমা থাকে। রান্নাঘরের দরজাটা কমজোরী, টেপা তালাটা বাজে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে রান্নাঘরে শুধু ফেলে রাখা হয় দৈনিক ব্যবহারের তেলের পাত্র, চিনির বৈয়ম, ডালের হাঁড়ি মসলাপাতির ছোট ছোট টিন, তরকারীর টুকরি, হাতাটা খুন্তিটা ফুটো এলুমিনিয়মের বাটিটা, টুকিটাকি জিনিষ। হাতা খুন্তি ফুটো বাটি বাদে চোর সব ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে গেছে। কোণে পিঁড়িটার ওপর পোয়াটাক পেঁয়াজ রাখা হয়েছিল, তাও বাদ দেয়নি। অথচ আশ্চর্য্য এই, একটা সত্যিকারের দামী জিনিষ ফেলে গেছে। কাল বেড়াতে এসেছিল কয়েকজন, আলমারী থেকে বার করা হয়েছিল দামী চায়ের সেটটা, ভুলে সেটা রান্নাঘরেই থেকে গিয়েছিল। চিনি রাখা সস্তা ফাটল ধরা বৈয়মটা চোর নিয়ে গেছে কিন্তু চায়ের সেটটা স্পর্শও করেনি।

দামী কিছু না যাক, দরজা ভেঙ্গে চুরি হয়েছে বাড়ীতে। কেদারের ঘুম ভাঙ্গাবার এ রকম আইন সঙ্গত সুযোগ ছাড়া যায় না।

সবাইকে ডেকে তোল্ তো দুগ্‌গা।

ঝিকে এই নির্দ্দেশ দিয়ে পঙ্কজিনী তর তর করে ওপরে উঠে যায়। কেদারকে উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে কিন্তু বড়ই সে অসুখী ও অসন্তুষ্ট।

হয়। চোর এলে, চুরি চলতে থাকলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে তুললে তার একটা মানে ছিল, চুরি যখন হয়েই গেছে, খবরটা দু'ঘণ্টা পরে তাকে জানালে কি আসত যেত কার!

কেদার হাই তোলে, তার শীর্ণ মুখে এঁটে থাকে স্নায়বিক পেটের গোলমালের তেলচিটে ক্লেদাক্ত ছাপ, চোখে চেতনা হারিয়ে গাঢ় সুপ্তিতে তলিয়ে থাকার মরাটে কামনা।

আমায় কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে তুমি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবে, বলে পঙ্কজিনী ঝঙ্কার দেয়।

পেটটা ব্যথা করে উঠেছিল শোয়ার আগে, কত ডাকলাম, উঠেছিলে? কেদার জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে সতীশ উঠেছে, রাজেন আর তার নতুন বৌও উঠেছে। চুরির বৈশিষ্ট্য বিচার করে সতীশ আর রাজেন চোরের জাত নির্ণয় করছে—ছেঁচড়া চোর নিশ্চয়। সেটা যেন প্রত্যক্ষ নয়, মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করা দরকার ছিল। দুগ্‌গা চেঁচিয়ে চলেছে, এ্যাঁকি কাণ্ড রে বাবা, আঁ! নতুন বৌ থেকে থেকে আহ্লাদী ভয়ের সুরে আবৃত্তি করছে, চোর এসেছিল, মাগো! কেদার নেমে এলে সে ঘোমটা একটু টেনে দেয়, গলা নামিয়ে নেয় ফিসফিসানিতে, অবশ্য তা কাণে যায় সকলেরই।

সবাই উঠেছে, শুধু দেখা নেই বিশ্বম্ভর ঠাকুরের। ঘুপচি ঘরের মধ্যে সে ঘুমিয়েই চলেছে নিশ্চিন্ত মনে, ঠিক কেদারের মত নাক ডাকিয়ে মৃদু সরু সুরে! রোজ সকালে তাকে ডেকে তুলতে হয় এমনি সে নবাব, কিন্তু সেটা পঙ্কজিনী মেনে নিয়েছে, নিরুপায় হয়ে, বাধ্য হয়ে। কিছু বলতে গেলেই ঠাকুর চাকর আবার গট গট করে বেরিয়ে যায়, যা

দিনকাল পড়েছে। ঠাকুরের পর্য্যন্ত মন জুগিয়ে চলতে হবে বাড়ীর গিন্নীর। আজ কিন্তু বড় রাগ হয়ে গেল পঙ্কজিনীর। ঘরের সামনে বাড়ীশুদ্ধ লোক হৈচৈ করছে তবু বাবুর ঘুম ভাঙ্গে না। দরজাটা যেন ভেঙ্গে ফেলবে এমনিভাবে ধাক্কা দিতে দিতে সে ডাকে, ঠাকুর! এই ঠাকুর! বাড়ীতে চুরি হয়ে গেল, কুম্ভকর্ণের মত তুমি ঘুমোচ্ছ!

বিশ্বম্ভর উঠে আসে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে। মুখে তার রাত জাগার স্পষ্ট ছাপ।

চুরি হইছি? তেমন আশ্চর্য্য হয় না বিশ্বম্ভর, একটু যেন থতমত খেয়ে যায়। রান্নাঘরটা দেখতে যায়, কিন্তু সে রকম ব্যগ্রভাবে যেন নয়। কেদারের মতই ভাব যেন তার খানিকটা, চুরি যখন হয়েই গেছে, উপায় কি!

তোমার কি হয়েছে ঠাকুর?

জ্বরভাব হইছি। মোটে ঘুম হয়নি রাতে।

ঘুম হয়নি? ঘুম হয়নি তো পাশের ঘরে সব চুরি হয়ে গেল টের পেলে না? শিকল ভাঙ্গার আওয়াজ শুনলে না?

মু কিছু শুনিনি তো?

একটু কেমন ভাব বিশ্বম্ভরের। কি ভাববে কেউ ভেবে পায় না। এ চুরির জন্য তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। পুরানো বিশ্বাসী লোক, চুরি ছ্যাচড়ামির স্বভাব নেই, ভাল রাঁধে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, উড়িয়া বাংলা বই পর্য্যন্ত পড়তে পারে কিছু কিছু। তাছাড়া, এত কিছু চুরি করার সুযোগ থাকতে গুড় তেল মসলা ডাল তরকারী এসব সে চুরি করতেই বা যাবে কেন! এ বাড়ীতে থাকে খায়, নিজের লোকও কেউ এখানে নেই তার যে চুরি করে ওসব তাদের দেবে। জ্বরভাব

হয়েছে, হয়তো ঘুমিয়েছিল চুরির সময়টা। আর চাড় দিয়ে রান্নাঘরের টিলে শিকলের গোড়াটা তুলতে কতটুকুই বা শব্দ হয়েছিল!

কিন্তু চোর এল, গেল কোথা দিয়ে? পাশের গলির দিকের খিড়কির দরজাটা বন্ধই ছিল, পঙ্কজিনী নিজে দুগগা ঝিকে খিল খুলে দিয়েছে। ও ছাড়া আর তো পথ নেই বাড়ীতে ঢুকবার। বাইরের ফাঁক দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে চোরের পক্ষে খিলটা খোলা সম্ভব, কিন্তু তারপর ভেতর থেকে খিলটা আবার লাগালো কে!

এ যেন রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনীর ধাঁধা!

নতুন বৌ জোর গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, দিদি, পাশের বাড়ীর ওই ধুমসো চেহারার চাকরটা ছাত দিয়ে—

তুমি থামো ভাই, পঙ্কজিনী বলে মুখ বাঁকিয়ে, ছাতের সিঁড়ির দরজা আমি নিজে বন্ধ করেছি।

নতুন বৌ তবু থামে না, বলে আলসেতে দড়ির সিঁড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে পারে তো? ভীষণ সিরিজের একটা বই-এ পড়েছিলাম—

পঙ্কজিনী কান দেয় না। বিশ্বম্ভর ঘরে ঢুকে শোয়ার আয়োজন করছে।

তুমি যে শুলে ঠাকুর?

মু ঘুমাব। মতে টিকে চা দিজ।

চা করবে কে শুনি?

মু পারিব না।

কেদার এমনিতেই ভয়ানক রগচটা মানুষ, তার ওপর অকালে ঘুম ভাঙায় মেজাজ এমন বিগড়ে ছিল যা মাথা খারাপ হয়ে যাবার সামিল বলা চলে। ঠাকুরের কাছে তেড়ে যায়, গর্জ্জে ওঠে।

ব্যাটা এত বড় বজ্জাত, মুখের ওপর জবাব দেয়! উড়িষ্যার নবাব এসেছেন! ওঠ বলছি হারামজাদা, কাণ ধরে তুলে দেব নইলে।

তুমি চুপ কর না? পঙ্কজিনী বলে।

গাল দিলি মুঁ থাকিব না।

বিশ্বম্ভ উঠে হাই তোলে। তারপর সাবান-কাচা সার্টটি গায়ে দিতে আরম্ভ করে। কথায় আর কাজে ব্যবধান রাখার পক্ষপাতী সে যেন নয়, এখুনি বেরিয়ে চলে যাবে।

পঙ্কজিনী ভাবে, সর্ব্বনাশ করেছে! এ বাজারে ঠাকুর পাওয়াই যে বিষম ব্যাপার সে তো হাড়ে হাড়ে তা জানে। বিশেষতঃ শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা এমন পাকাপোক্ত ঠাকুর, একবার শুধু বল্লে ঠিকমত সব রান্না করে দেয়, কষ্ট করে গা তুলে রান্না ঘরে গিয়ে একবার দেখিয়ে পর্য্যন্ত দিতে হয় না। নির্ভর নিশ্চিন্ত মনে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো চলে। রাখালবাবুর বৌ আঁতুড়ে, কদিন খুঁজে খুঁজে একটা আনাড়ি লোকও পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। ভূষণবাবু তিনটে ঠাকুর আনলেন পর পর, দু'চার দিন কাজ করেই দু'জন চলে গেল রেষ্টুরেণ্টে কাটলেট ভাজতে, আরেকজন পান বিড়ির দোকান দিয়ে বসল গলির মোড়ে। বাঙালী উড়িয়া হিন্দুস্থানী নির্ব্বিচারে ভূষণবাবুর গিন্নী দুবেলা রাঁধুনী বামুনের জাতটাকেই অভিশাপ দেয়। এবেলা চলে গেলে এবেলাই অন্য বাড়ী কাজ পাবে বিশ্বম্ভর, যার বাড়ী যাবে সেই লুফে নেবে, মরণ হবে তার। হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হাড় কালি। নতুন বৌ সাতদিনের মধ্যে অসুখের ছুতায় বাপের বাড়ী পালাবে, যদ্দিন না জানবে ঠাকুরের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে তদ্দিন আর এ মুখো হবে না।

অগত্যা মিষ্টি কথা বলে তাকেই ঠাণ্ডা করতে হয় বিশ্বম্ভরকে।

বলে, কে আবার তোমায় গাল দিলে শুনি ?

বিশ্বম্ভর বলে, মু বামুনের ছেলে, খাটি খাইছি, মু গাল সহিব না।

পঙ্কজিনী আরও মিষ্টি স্বরে বলে, কি পাগলামি কর ঠাকুর। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে নাও, কেউ তোমায় গাল দেবে না। শরীর হয়েছে, শুয়ে থাক, কে বারণ করছে ? চা দেব এখন।

তারপর অবশ্য চা তৈরী করে বিশ্বম্ভর নিজেই, আপিসের রান্নাও চাপায়। কয়লা দুর্লভ বস্তু, কিন্তু আজ বড় দেরী হয়ে গেছে, পঙ্কজিনীর অনুমতি নিয়ে আরেকটা উনুনও সে ধরিয়ে ফেলে! এক উনানে চাল আর অন্যটায় ডাল চাপিয়ে তাগিদ দেয়, বাজার যাব না ?

লোকটা কাজের মানুষ। সাধে কি পঙ্কজিনী ওকে এত খাতির করে।

জ্বরভাবের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না, শুধু ঘুমকাতুরে মনে হয় তাকে।

আর মনে হয়, আজ যেমন সে আশ্চর্য্যরকম শান্ত, তেমনি বেশী রকম সজীব।

রাস্তার কলে গিয়ে কাপড়কাচা-সাবান গায়ে ঘষে চান করে আসে বিশ্বম্ভর, জানালা দিয়ে পঙ্কজিনী তাকিয়ে ছাখে। রান্না চড়াবার আগে চান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে নেবার প্রথা এ বাড়ীতে চালু নেই, অন্যদিন বিশ্বম্ভর নাইতে যায় রান্না শেষ করে। জ্বরভাব হলে বোধ হয় চান করাটা নিয়ম উড়িয়াদের। নেয়ে আসার পর বেশ চাঙ্গা দেখায় বিশ্বম্ভরকে। অন্যদিনের চেয়ে বেশী উৎসাহের সঙ্গে সে কাজে লেগে যায়। কেমন যেন আনমনা খুসী খুসী ভাব তার। ডালে কাঁটা দিতে দিতে গুণ গুণ করে গান গাইতেও শোনে পঙ্কজিনী, 'মটবরো' কথাটা কানে

আসে অনেকবার। তার তামাটে মুখখানা একটু যেন সুশ্রীই মনে হয় আজ পঙ্কজিনীর। উড়িয়া ঠাকুর, সে তো একটা রান্না করা নোংরা জীব, পাজী আর বজ্জাত, চোর আর কামুক। সে যেন নিজেকে বাতিল করে খানিকটা মানুষ হয়ে উঠতে চাইছে পঙ্কজিনীর বিচারেও!

সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমায় বিশ্বম্ভর। বিকালে দিনের ঘুমে থমথম করে তার মুখ, কিন্তু একটু চঞ্চল, উৎসুক মনে হয় তাকে। কিছু বুঝে উঠতে পারে না পঙ্কজিনী। তিন বছর আছে লোকটা, এমন ভাব কখনো সে ত্থাখেনি তার। কেবল গোড়ার দিকে দেশ থেকে সবে এসে যখন কাজে ঢোকে রান্নার বিত্থায় চরম আনাড়িত্ব নিয়ে, তখন কিছুদিন এরকম ছটফটানি ছিল। দেশের জন্ত মন কেমন করত নিশ্চয়। দেশে যাবার মতলব করেছে নাকি? সেবার দেশ থেকে এসে ছটফট করেছিল মনমরা হয়ে, এবার দেশে যাবার ছট-ফটানিতে এমন ফূর্ত্তির ভাব?

ছুটি চাইলে দিতেই হবে ছুটি, তিন বছর একটানা কাজ করে আসছে। লম্বা ছুটিই দিতে হবে। তবেই সেরেছে!—প্রথমে ভাবে পঙ্কজিনী। তারপর জোর করে দুর্ভাবনাটা ঠেলে দিয়ে ভাবে, তা হোক। তারা নয় কষ্ট করে নিজেরাই রাঁধবে পনের দিন, একমাস। আহা, দেশে আপনজনেরা আছে, তিন বছর বেচারী তাদের মুখ ত্থাখেনি। বিয়ে থা করার সাধ হয়েছে হয় তো। দেশে টাকা পাঠাতে হয়, নিজে কত কষ্ট করে থেকে কিছু কিছু করে টাকা জমিয়েছে, যাতাযাতের খরচটা পর্য্যন্ত বাঁচাবার জন্ত তিন বছর দেশে যাবার কথা মুখে আনেনি। আহা, এই যোয়ান বয়স, এখন না করলে কবে আর বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে। নাঃ, চাওয়ামাত্র পঙ্কজিনী ওকে ছুটি দেবে, দেড়মাস

ছমাসের ছুটি দেবে পুরো মাইনে শুদ্ধ, আগাম দেবে মাইনেটা। বিয়ে করে বৌয়ের সাথে কাটিয়ে আসুক কিছুদিন। উড়িয়া বলে কি মানুষ নয় লোকটা ?

তিন বছর পরে আজ প্রথম এসব কথা ভাবে পঙ্কজিনী !

কাল বড় চুরিটাতেও বিশ্বম্ভরকে সন্দেহ করতে পারেনি আজকের টুকিটাকি চুরির জন্যও তাকে সন্দেহ করা যায় না। তবু তাকে বাজারে পাঠিয়ে তার ঘুপচি ঘরটা একবার খুঁজে দেখে আসতে গিয়েছিল পঙ্কজিনী। চোরাই জিনিষ কিছু খুঁজে পায় নি, কিন্তু বিশ্বম্ভরের ভাঙ্গা টিনের স্যুটকেসটিতে আবিষ্কার করেছিল একখানা নতুন তাঁতের শাড়ী, সস্তা এবং একটু জ্যালজেলে কিন্তু রঙীন। পঙ্কজিনী মুচকে হেসেছিল।

দুপুরে মেঘ করে আসে আকাশে। গুমোটের ঘামে যেন নিজের গা থেকেই পচা ফুলের গন্ধ মেলে। মনটা অস্থির অস্থির করে পঙ্কজিনীর, কেমন একটা কষ্টকর বিষাদ ঘনিয়ে আসে। ছুটির দিন হলে, কেদার বাড়ী থাকলে, আজ হয় তো তাকে একটু আদর করত। মাঝে মাঝে করে।

ঘরে মন টেঁকে না, পঙ্কজিনী ছাতে যায়। আলসেয় ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে বস্তির গা ঘেঁষা দুটি বাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে এ সময় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ওঠে দু'বাড়ীর ছাতে, কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট কথা বলেই চট করে নেমে যায়। আজ ওরা ছাতে উঠবে কিনা কে জানে। বস্তির খোঁড়া মেয়েটা ঘুঁটের টুকরি মাথায় নিয়ে আসছে গলি দিয়ে। ওর ঘুঁটেগুলি ছোট ছোট বিশ্রী, দামও বেশী নয় কোনদিন ওর কাছে ঘুঁটে রাখে না পঙ্কজিনী।

তাই, বিশ্বম্ভরের ব্যাপার দেখে ছাতে দাঁড়িয়ে থ' মেরে যায় পঙ্কজিনী। দূরে থেকে ঘুঁটে চাই গো ডাক শুনেই বিশ্বম্ভর যেন লাফিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খোলে খিড়কির, এই ডাক শোনার জন্য যেন কাণ পেতে ছিল। একেবারে সে ভেতরে নিয়ে আসে মেয়েটাকে। আগে দু'বার বিশ্বম্ভর ঘুঁটের পয়সা চেয়ে নিয়েছে তার কাছে, কখন ঘুঁটে রেখেছে পঙ্কজিনী টের পায়নি। তাকে লুকিয়ে ওর কাছে ঘুঁটে রাখে বিশ্বম্ভর! রান্নাঘরের বারান্দার কোণে কেরাসিন কাঠের ঘুঁটের বাক্স, সেখানে চোখের আড়াল হয়ে যায় দু'জন। ঘুঁটে গুনে রাখতে গিয়ে নোংরা হয়ে যাবে ধোয়া মাজা রান্নাঘরের বারান্দা। তা নয় গেল, ধুয়ে দিলেই আবার সাফ হয়ে যাবে বারান্দাটা, কিন্তু এতক্ষণ লাগে ও কটা ঘুঁটে গুণতে? পা টিপে টিপে নেমে যায় পঙ্কজিনী। কলঘরে চৌবাচ্চায় উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় উঁচুতে বসানো ছোট ফোকরের ঘষা-কাঁচের-শার্সি একটু ফাঁক করে। রাগে নয়, কৌতূহলে নয়, অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বুক তার ঢিপ ঢিপ করে।

দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। ঘুঁটের দরদস্তুর নয়, অন্য। সব ঘুঁটে এখনো খোঁড়া মেয়েটার টুকরিতেই রয়েছে।

হুঁ, হুঁ, কাপড় আনিছি। কতবার বলিব?

এনেছ? দাও না এখন?

উঁহু, রাত্রে দিব।

মেয়েটার গাল টিপে দেয় বিশ্বম্ভর, চোখ তুলে চেয়ে মেয়েটা হাসে। সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে যায় পঙ্কজিনীর। ঘুঁটে আর গোণা হয় না, টুকরি শুদ্ধ ঘুঁটের বাক্সে ঢেলে দেয় বিশ্বম্ভর।

বিকেলে বিশ্বম্ভর পয়সা চায় ঘুঁটের।

ঘুঁটে রেখছ নাকি? কত? পঞ্চাশ মোটে! কেন বেশী রাখতে পারলে না?

আউ ছিল না।

না, বাড়িয়ে বলেনি বিশ্বম্ভর, পঞ্চাশটার মতই ঘুঁটে ছিল টুকরিতে

কার কাছে রেখেছ? হাসি চেপে শুধায় পঙ্কজিনী।

ঘুঁটেওলা আসিথিল।

কখন আসিথিল?

দুপুরে আসিথিল, আপুনি ঘুমাচ্ছিলে।

রাত এগারোটা বাজে, পঙ্কজিনী ঘুমায় না। কেবলি উসখুস করে, বলে বড্ড গরম আজ, ঘরে টেঁকা যায় না। থেকে থেকে সে বাইরে যায়। এত রাতে একা অন্ধকার ছাদে গিয়ে ঘুরে আসে, সিঁড়ির কাছে যেতে যে পঙ্কজিনীর গায়ে কাঁটা দেওয়ার কথা।

কেদার বলে, কি হল তোমার আজ?

কি আবার হবে? শোবে না তুমি, ঘুমোবে না? শুয়ে পড়, একটা দিন ঘুমোও সকাল সকাল।

গোমড়া মুখে কেদার বলে, ঘুমোতে চাইলেই কত ঘুম আসে।

চেষ্টা কর না? সেই ঘুমের ওষুধটা খাবে?

কি ভেবে আজ ঘুমের ওষুধ না খেয়েই কেদার শুয়ে পড়ে, ঘুমোবার চেষ্টা করে। একটু যেন তন্দ্রার ভাব এসেও যায় তার পনের বিশ মিনিটের মধ্যে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায় পঙ্কজিনী। খিড়কির দরজার খিলটা খুলবার ও লাগাবার সময় ক্যাঁচ করে একটু আওয়াজ হয়। একটু আগে দুটো শব্দই সে শুনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হয় শরীরটা যেন হাল্কা হয়ে গেছে।

মনে কিন্তু উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত তোলপাড় স্থরু হয়েছে, বস্তির একটা খোঁড়া মেয়ে আর বাড়ীর উড়িয়া ঠাকুরের বাসর ঘরে আড়ি পাততে যাবার বদলে সে নিজেই যেন চলেছে অভিসারে। কত বছরের বদ্ধ পচা একঘেয়ে নিস্তেজ জীবনে হঠাৎ এসেছে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, সে যেন ফিরে গেছে দশ বছর আগেক র তার বিয়ের প্রথম দিনগুলিতে, কেদারের পেটে যখন স্নায়বিক বদহজম আর জ্বালা-যন্ত্রণার স্বষ্টি হয় নি, ঘুমের জন্য তপস্যা করার বদলে না ঘুমিয়েই সে যখন ছিল খুসী।

দরজা জানালা বন্ধ করে বিশ্বম্ভর আলো জ্বেলেছে। ফুটো আছে চোখ পাতার। ঘরের ভেতরটা পঙ্কজিনী দেখতেও পায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রঙীন শাড়ীখানা দেখতে দেখতে আনন্দে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম করছে মেয়েটা, থেকে থেকে অস্ফুট শব্দ করে উঠছে। বিশ্বম্ভর সাবধান করে দিচ্ছে তাকে, তার মুখে তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি। এত স্থখ, এত আনন্দ, এত তৃপ্তি ওদের ওই একটা সস্তা শাড়ী দেওয়া নেওয়া নিয়ে? কত দামী দামী শাড়ী তাকে এনে দিয়েছে কেদার, কখনো তো এমন আত্মহারা তারা হতে পারেনি!

সিঁড়িতে অনভ্যস্ত মানুষের পা টিপে টিপে নামার শব্দ আসে, হঠাৎ জ্বলে বারান্দার আলো। কেদার নেমে এসেছে। পঙ্কজিনী ছিটকে সরে যায় তার কাছে। মুখে আঙ্গুল দিয়ে মানা করে কথা কইতে, ইসারা করে ডেকে নিয়ে যায় ওপরে নীচের বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে।

কেদার বলে, কি করছিলে তুমি ওখানে?

কেদারের মুখ দেখে গা জ্বলে যায় পঙ্কজিনীর। মানুষটাকে কামড়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

যাই করি, তোমার কি ? চাপা গলায় ফোঁস করে ওঠে পঙ্কজিনী, পিছু পিছু ধাওয়া করেছ কেন ?

ভেঙ্গে গলে কাদা হয়ে যায় কেদার তার মূর্ত্তি দেখে, বলে, আহা রাগছ কেন ? আমি কি কিছু বলছি ! শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে।

ঝগড়া করার সময় নেই, সময় বয়ে চলেছে। পঙ্কজিনী সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানায়।

বটে ! ব্যাটা এমন পাজী ? কেদার বলে আগুন হয়ে, হারামজাদাকে জুতো মারতে মারতে—

চুপ্ ! চেঁচিও না। কিছু করতে পারবে না তুমি। এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। যদি কিছু হাঙ্গামা কর, আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব বলে রাখছি।

কেদার ভড়কে যায়।—কিছু করব না ? বাড়িতে এ নোংরা ব্যাপারকে তুমি প্রশ্রয় দেবে ?

কিসের নোংরা ব্যাপার ? ওদের যদি ভালবাসা হয়ে থাকে। ওকি তোমার ছেলে না ভাই যে শাসন করতেই হবে তোমাকে ? তোমার তো কোন ক্ষতি করছে না। তুমি চুপচাপ শুয়ে ঘুমোও। পিছু পিছু যেওনা কিন্তু আমার, ভাল হবে না।

তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

একটু আড়ি পাতব।—এবার মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে যায় পঙ্কজিনী। কেদার স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

রঙীন শাড়ীটা পরেছে মেয়েটা। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে নিজেকে। তার ঘরে মানুষ-সমান আয়নাটা যদি থাকত, এমন করে

বেচারীকে দেখবার চেষ্টা করতে হত না নতুন শাড়ী পরে কেমন দেখাচ্ছে নিজেকে।

বিশ্বম্ভর বলে, শুনিছ? জিনিষ চুরি আর হব না। একগোটা আলু না, বেগুন না, কিছু না।

পঙ্কজিনী উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বিশ্বম্ভর বোঝায় মেয়েটাকে কেন সে তরকারী চাল ডাল কিছু কিছু সরিয়ে তাকে আর দিতে পারবে না। বাড়ীর গিন্নীটা বড় ভালো মানুষ, বোকা, কিন্তু তার মনে সন্দেহ জেগেছে। এরপর ওভাবে টুকিটাকি চুরি চালাতে গেলে হয়তো ধরা পড়ে যাবে। শুনতে শুনতে সব চুরির রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় পঙ্কজিনীর কাছে। রাগ একটু হয় কিন্তু উদারভাবে সে মনে মনে ক্ষমা করে চুরির অপরাধটা বিশ্বম্ভরের। শুধু খাবার জিনিষ চুরি করেছে বিশ্বম্ভর। প্রিয়া খেতে পায় না জেনে প্রেমিক যদি তরি-তরকারী চাল ডাল চুরি করে তাকে দেয়, সেটা বোধ হয় অন্যায় হয় না তেমন!

মেয়েটা বলে, কাল তো দুটো আলু, পুঁচকে একটা বেগুন আর এতটুকু আটা দিলে, তাও টের পেল?

বিশ্বম্ভর বলে, হুঁ, মতে বলিল কি, পাঁচ গোটা আলু ছিল, দুটা গেল কাঁইকি?

ওমা! গালে হাত দিয়ে মেয়েটা বলে, মুটকো মাগীটাতো কম কেপ্পন নয়!

যেন চাবুক খেয়ে চমকে ওঠে পঙ্কজিনী।

বিশ্বম্ভর হাসে, কেতে সখ বুড়ী মাগীর, কেতে ঢং। হাসি পায়, মু হাসি না।

পঙ্কজিনীর চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে ছুটে আসে সবাই। সকলের আগে

আসে কেদার। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। আশে পাশের বাড়ীতে পর্য্যন্ত। হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রতিবেশীরা, কি হয়েছে? চোর ধরা পড়েছে শুনে কয়েকজন ছুটে আসে আশেপাশের বাড়ী থেকে। পুলিশ ডাকতে ছুটে যায় পাড়ার সব কাজে উৎসাহী যুবক সতীশ।

ঘর থেকে একজন টেনে বার করে আনে মেয়েটাকে। ভয়ে সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার কেঁদে ওঠে।

তখন বিশ্বম্ভর বলে অনুনয় করে, উয়ার দোষ নাই, মু চুরি করিথিল। মু সব মানি নিব, জেল খাটিব। উয়াকে ছাড়ি দিঅ।

পঙ্কজিনী ঝেঁঝে ওঠে, ওই ছুঁড়ি আসল চোর।

বিশ্বম্ভর বলে, উয়ার দোস নাই, মতে চুরি করিথিল।

পঙ্কজিনী বলে, ওই ছুঁড়ি আসল চোর। ওকে আমি জেলে দেব। তোকেও জেলে দেব। তুইও চোর।

চালক

দোতলা বাস রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে থাকে অজিত। গাড়ির ঝাঁকানি, ষ্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনি, ইঞ্জিনের গর্জন তার মধ্যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন তোলে, নারী-সঙ্গের জীবন্ত পুলকের মত যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে পৌরুষের সার্থকতা। আজ ক'দিন ধরে সে বাসটা চালাচ্ছে, কিন্তু এত বড় একটা দৈত্যকে আয়ত্তে পাবার গর্ব, হাত ও পায়ের ইঙ্গিতে খুশীমত একে থামানো, আস্তে বা জোরে যেমন ইচ্ছা চালানো এসবের রোমাঞ্চ এতটুকু কমেনি, পুরানো হয়নি।

দাঁড়ানো গাড়ির চলন্ত ইঞ্জিনটার একটানা দাপড়ানিতে, গিয়ার বদলাতে, স্টিয়ারিং ধরে থাকতে আর ব্রেক কষতে গিয়ে সে টের পায়, আগে সে যে ছোট বাসটা চালাত, তার চেয়ে এ-ইঞ্জিনের জোর কত বেশি, কত বড় আর ভারি এ-বাসটা। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার কম হলে অজিতের মনটা খুঁত খুঁত করে, প্রায় খালি গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার মনে হয় বিরাট একটা ক্ষমতার যেন অপচয় ঘটছে, ছোট ছেলের কাজ করতে হচ্ছে জোয়ান-মদ্দ জবরদস্ত মানুষকে। ওপরে-নীচে গাদাগাদি করে প্যাসেঞ্জার উঠলে গাড়ি চালানোর উল্লাস তার বেড়ে যায়। একতলা বাসগুলির দিকে সে তাকায় অনুকম্পার দৃষ্টিতে।

নিজেও সে যে কয়েক বছর ধরে একতলা বাস চালিয়ে এসেছে, মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, ওরকম একটা ভাঙ্গা পুরাণো নড়বড়ে বাস নিয়ে সে পাড়ি দিত সহরের এ মাথা থেকে ও মাথা, তা যেন সে ভুলেই গেছে একেবারে। মন তার চিরদিন ছিল দোতলা বাসের দিকে, এক দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার উস্কানিতে দোতলা বাস হাঁকাবার স্বপ্নই সে দেখে এসেছে বরাবর! স্বপ্ন সফল হওয়ামাত্র একতলা বাসের দিনগুলি তুচ্ছ নগণ্য হয়ে গেছে তার কাছে, একতলা বাসের ড্রাইভারি পাবার পর যেমন গিয়েছিল ক্লিনার থাকার দিনগুলি।

সিনেমার স্টপে অনেক হবুপ্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়েছিল দুর থেকেই। আজ ঠিক টাইম মত পৌছানো গেছে, সিনেমার দুপুরের শো'টা সবে ভেঙেছে। এইজন্যই সে এতক্ষণ থামিয়ে থামিয়ে আস্তে চালিয়ে নিয়ে এসেছে গাড়ী, এখানে প্যাসেঞ্জার তুলে এবার জোরে চালিয়ে টাইম পুষিয়ে নেবে। এখানেই গাড়ি প্রায় ভরে যাবে তার, ট্রিপটার প্রথম দিকে! সারা ট্রিপটা চলবে বোঝাই গাড়ি, ওপরে নীচে ঠেসে ভরে গিয়ে বাইরে পর্যন্ত বাদুড় ঝুলবে প্যাসেঞ্জার—ছুটির দিন বলে, অফিস-ফেরতরা নেই বলে, ভাবনার কিছু নেই।

খানিক দুর থেকে সিনেমার সামনে জমানো প্যাসেঞ্জার দেখেই অজিত হুস্ করে স্পিড বাড়িয়েছিল, স্পিডের মাথায় পিছু হেলে প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ী থামায়। অ্যাক্সিডেণ্ট বাঁচাবার জন্য ছাড়া এরকম বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় খেয়ালের খাতিরে, গাড়ীর প্যাসেঞ্জাররা হুমড়ি খেয়ে ব্যথা পায়, গাড়ীরও ক্ষতি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহাদুরি করার ঝোঁক সে সামলাতে পারে না। কণ্ডাক্টর কেদার খিঁচিয়ে উঠে গাল দেয়। সে পুরাণো লোক, নিয়ম ভঙ্গে বিরক্ত-

হয়। তার সহকারী ছোঁড়া উল্লাসে চেঁচিয়ে তারিফ জানায়। হবু প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দাদা-বৌদি আর তাদের বড় দুটি মেয়েকে দেখে অজিতের খুশির সীমা থাকে না।

মীনা! খুকু! বায়স্কোপ দেখতে এইছিস? উঠে পড়! উঠে পড়! বিনা পয়সায় আজ মজাসে বাস চড়বি!

মীনা ভুরু কুচকে ঠোঁট বাঁকায়, তার বয়স প্রায় ষোল। খুকু সবে দশে পা দিয়েছে, সে আগে আড়চোখে মা-বাবার ভাবটা দেখে নিয়ে হুট্ করার ভঙ্গিতে মুখ তুলে ঝাঁকি দিয়ে অবজ্ঞা জানায় স্পষ্টভাবে। অসিত চেয়ে থাকে রাস্তার অপর দিকের ফুটপাথে, বেলারাণী হাতে দলা পাকানো ছোট্ট লেডিজ রুমালটি তিনবার নাকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে তিনবার নাক সিঁটকোয়।

অজিত হাই তোলে। প্যাঁক প্যাঁক করে হর্নটা বাজায়, পা টিপে টিপে ইঞ্জিনকে গর্জে গর্জে তোলে। আর তাকায়ও না দাদাবৌদি ভাইপো ভাইঝিদের দিকে, সোজা সামনে রাস্তায় চোখ পেতে রাখে। কণ্ডাক্টরের ইঙ্গিত পেয়েই গাড়ী ছেড়ে দেয়।

দোতালা বাসের ড্রাইভারের এই আসনে বসে না থাকলে এ-ভুলটা সে নিশ্চয় করত না। পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে হঠাৎ ওদের দেখলে, এমন কি, একতলা বাস চালাবার সময়ও ওদের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, আকার-ইঙ্গিতেও সে প্রকাশ পেতে দিত না যে ওদের সে দেখেছে, ওরা তার আত্মীয়। দোতলা বাস চালানোর গর্বে আর আনন্দে সে ভুলেই গিয়েছিল ওদের কাছে সে ভদ্রলোক নয়, সে নিছক বাসড্রাইভার, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের কলঙ্ক। খুশিতে আত্মহারা হয়ে নইলে কি সে রাস্তায় এত লোকের সামনে আত্মীয়তা

ঘোষণা করে ওদের এমন লজ্জা দেয়—বাড়িতেও যে চেষ্টা করার ফলাফলের কথা দোতলা বাস চালাতে শুরু করার পরেও সে ভুলতে পারেনি, নিজেকে অপমান করতে চায়নি। সত্যি কথা বলতে কি, অজিত স্বীকার করে নিজের কাছে ওদের কাছে সে ছোটলোক। ভাবনার মধ্যেই মাঝবয়সী হাবা ভদ্রলোকটাকে ব্রেক-কষা স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশলে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়। সে ভেবেছিল তাকে এমন একটা বিরাট বাস চালাতে দেখে অবজ্ঞা করার বদলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে, সম্মান করবে তাকে। ভেবেছিল মানে আর কি, ওদের দেখে হঠাৎ-জাগা উল্লাসে কথাটা চিড় খেয়ে গিয়েছিল মনের ভিটেয়!

যাকগে। মরুক গে। চুলোয় যাক। দোতলা বাসে উন্নতি হয়েছে শুনেও নিজের বৌ যার নাক সিঁটকোয়, তার আবার দাদা-বৌদি-ভাইঝিদের কাছ থেকে খাতিরের প্রত্যাশা!

সেটাই তার লাস্ট ট্রিপ। হিসাবমত আগের ট্রিপটাতেই তার ডিউটি শেষ হত, ইন্দ্রজিৎ সিং সময়মত না আসায় আরেকবার ঘুরে আসতে হয়েছে শহরের অপর প্রান্ত থেকে। সেজন্য কিছু আসে যায় না। কাল দরকার হলে ইন্দ্রজিৎ তার হয়ে একটা বেশী ট্রিপ দেবে। এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা কামড়া-কামড়ি করে না।

ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে সরে বসে। বাড়ির গলিটার মুখ পর্য্যন্ত বাস চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অজিত নেমে পড়ে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা। বিড়িওলা রহমৎ তার জন্য বেছে-রাখা কড়া-শেঁকা বিড়ির প্যাকেটটি হাতে তুলে দিয়ে পয়সা গুণে নিয়ে হেসে বলে, ক'টা চাপা দিলে?

এক শালাকে দিচ্ছিলাম। বাবুর হাতে রেশনের শাড়ি দেখে মায়া হল, সামলে নিলাম। বৌটা বুক চাপড়াবে!

একসঙ্গে আটজন হাসে এ রসিকতায়, ছ'জন যারা বিড়ি পাকাচ্ছিল তারা এবং রহমৎ ও অজিত। টাটকা একটা বিড়ি ধরিয়ে অজিত এগোয়—আস্তে আস্তে। বাড়ি পৌঁছতে যেন তার অনিচ্ছা আছে। দোতলা বাস চালাবার পরিশ্রম সহজ নয়, হাড়ে-মাসে সে টের পাচ্ছে শ্রান্তি, তবু যেন মন চায় না বাড়ি পৌঁছতে। বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত যেন তার আসল জীবনের, বাঁচার আনন্দের সীমা: তারপর শুধু কষ্ট—ভদ্র পরিবারে ভদ্রভাবে আত্মগোপন করে থাকার বিশ্রী কষ্ট। দি গ্রেট ক্যালকাটা লণ্ড্রী অ্যাণ্ড টেলারিং শপের কানাইয়ের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে। ট্যাক্সিচালক হরনামের ঘরের সামনে একহাত রোয়াকটুকুতে বসে জিজ্ঞাসা করে তার ছেলেটার অসুখের খবর। বাড়ি পৌঁছানো যেন পিছিয়ে দিচ্ছে, যতক্ষণ পারে ঠেকাচ্ছে। খিদেয় পেট জ্বলছে, তবু!

বাড়ির চৌকাট ডিঙ্গোলেই সে আর মানুষ থাকবে না, হয়ে যাবে হালদার পরিবারের লজ্জা, আপশোষ, কলঙ্ক, জন্ম-বয়াটে, ম্যাট্রিক পাশে অক্ষম, বিড়ি ফোঁকা, দেশি খাওয়া, কাঠখোট্টা ভূত—এককালীন মোটর ক্লিনার, অধুনা বাস ড্রাইভার।

সদর পেরিয়েই অজিত সামনে পড়ে বুড়ো বাপের। সেঁতসেঁতে উঠানের চেয়ে আধ-হাত উঁচু বারান্দায় সেকেলে বেঢপ শক্ত কাঠের চেয়ারে বসেছিল রসিক হালদার, হাতে গড়গড়ার নল। অজিতের মা মোক্ষদা দু-তিন দিন অন্তর কলকে ভাঙ্গে—টানাটানির সংসারে তামাক খেয়ে, গয়াবিষ্টুপুর মেশানো দু'টাকা সের তামাক খেয়ে, পয়সা নষ্ট করা তার সয় না। গড়গড়া বা নলটা মোক্ষদা ভাঙ্গে না।

এইজন্য ভাঙ্গে না যে, ওসব নতুন কিনতে পয়সা লাগে অনেক এবং কেনা যে হবেই পৃথিবী চুলোয় গেলেও সেও তো জানা কথা।

অজিত, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রসিক বলে গম্ভীরভাবে, কথার আগে ও পরে গড়গড়ার নলে জোরে জোরে টান দিয়ে।

অজিত আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যই কি রসিক আজ এখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে? নতুন কি দোষ করেছে, নতুন কি কলঙ্ক এনেছে হালদার পরিবারে, অজিত ভেবে পায় না। দাদা-বৌদি-ভাইঝিরা এসে কি নালিশ করেছে প্রকাশ্য রাজপথে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার অমার্জনীয় স্পর্ধার বিরুদ্ধে? রসিক কি তাকে সতর্ক করে দেবে যে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন সে এরকম কাজ না করে?

বলুন।

অজিত বলে বিস্ফোরণ-আটকানো বোমার মত মৃদু স্বরে। বাবা! চার ছেলের বাবা! দুটি চাকুরে আর একটি এম-এ পড়া ছেলের জন্যই যার পিতৃত্বের পরম সার্থকতা, মোটর সাফ করা আর বাস চালানো অভদ্র ছোটলোক ছেলেটা তিন ছেলের ভদ্রজীবনে কলঙ্কের কালিমা না করে এই যার ভয়—সে যে ভাই, এই কলঙ্ক সয়ে যাওয়াই ওদের পক্ষে যথেষ্ট, অসীম উদারতা—এই যার বিশ্বাস এবং এজন্য তিনটি উপযুক্ত ছেলের কাছে সে রীতিমত কৃতজ্ঞ। অজিত জানে মুস্কিল ওইখানে। তার জন্য, অপদার্থ অপাংক্তেয় তারই জন্য, বড় প্রাণ কাঁদে বুড়ো বাপটার। তার কামনা ভাই তিনজনের কাছে নিজের অস্তিত্ব

যতদূর সম্ভব লোপ করে, চোখকান মুখ বুজে, মাথা নীচু করে, সে এই বাড়িতেই সুখে বাস করুক বৌ আর ছেলেটা নিয়ে!

সংসারে সে খরচ দেয়—কিছু বেশীই দেয় দুটি রোজগেরে ভাইয়ের চেয়ে। ওদের অন্য খরচ বেশী। ভদ্রভাবে খাওয়াপরা চলাফেরার খরচ, তাই তার চেয়ে অনেক বেশী দেবার কথা স্থির করা থাকলেও কয়েক বছরের মধ্যে দু এক মাস ছাড়া কোনবারেই বেশী দিতে পারে নি। দিতে পারে, অজিত জানে, দিতে পারে। ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটা একটু কমালেই অনায়াসে দিতে পারে।

কিন্তু আজ যেন কেমন একটা ভাবান্তর ঘটেছে রসিকের সে অনুভব করে। তাকে সমালোচনা ও উপদেশ শোনানো রসিকের অভ্যাস নয়।

মুখ হাত ধুয়ে চা'টা খেয়ে আয়।

চা'টা খেয়েছি। চান করে ভাত খাব একেবারে। কি বলছিলেন?

তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ! গড়গড়াটা টানতে টানতে রসিক বলে, গুরুতর কথা শান্ত মনে বিচার করতে হয়।

আমার মনে বেশ শান্ত আছে, অজিত শান্তকণ্ঠে বলে, সারাদিন খেটেখুটে এসে চানটান করে খেয়ে বিশ্রাম না করে, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। কি বলচেন বলুন। নয়তো কাল বলবেন।

এই তো দোষ তোমার! রসিক বলে, আপশোসের সুরে, কিন্তু বেশী চটে না গিয়ে, সেটা আরও আশ্চর্য করে দেয় অজিতকে! —বিষয়ের গুরুত্ব বোঝো না তুমি। কথাটা হল কি; তুমি বরাবর অসিত সুজিতের সমান সংসার খরচ দিয়ে এসেছো। ওদের ডবল দেওয়া

উচিত ছিল। যাকগে, অসিতের মেয়ের বিয়ের ভাবনা আছে সুজিতের বৌটা নিত্য রোগী, এক মেয়ে বিয়োতে ওর হাজার টাকা খরচ—ভবিষ্যতে কি যে করবে ভগবান জানেন! আমি বলি কি, ওদের সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই, ওরা একরকম, তুমি অন্যরকম। কি দরকার তোমাদের একসাথে থাকবার? আমার জন্যে আমার ভয়ে একসাথে থেকেছে, নয়তো কবে তোমায় ওরা ভিন্ন করে দিত। এ অবস্থায়, আমার মতে, তোমার ভিন্ন হওয়া উচিত। ওই বাড়তি ভাঁড়ার ঘরটা তুমি রান্নাঘর করতে পার—কাল থেকে তাই হবে। কাল পয়লা না? হ্যাঁ, কালকেই পয়লা।

বেশ তো তাই হবে।

অজিতের সংক্ষিপ্ত গা-ছাড়া জবাব বড়ই ক্ষুণ্ণ করে রসিককে।

একবার ভাবলে না, বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না, বলে বসলে, তাই হবে? তোমার এই মতিগতির জন্য—

উদাসীন ভাবটা ত্যাগ করে এবার অজিত জোর দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, সংসারের ব্যবস্থায় আমার মতিগতির প্রশ্ন কি? আমি কিছু করতে গেলে বলতে গেলেই আপনিও রাগ করেন, আপনার বৌমাও ক্ষেপে যান। আপনারা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝেন তাই করুন!

একি একটা কথা হল অজিত? রসিক বলে কাতরভাবে, তোমার দু'শোর ওপর আয় বেড়েছে শুনে থেকে ভাবছি এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। এদিকে সুজিতের চাকরীটাও গেল। অনেক আগেই তোমায় ভিন্ন হতে বলা বোধ হয় উচিত ছিল, ভুল করেছি মনে হয়। লেখাপড়া শিখলে না, মানুষ হলে না, ভেবেছিলাম ভাইদের সঙ্গে থাকলে সময়ে অসময়ে তবু—

নলটা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকে থাকে, চিন্তার অনেকগুলি রেখা ফুটে থাকে চামড়ার কুঁচকানিতে।

বৌমাও যেন কেমন। ওরা পছন্দ করে না, আমল দেয় না, তবু বেহায়ার মত লেপ্টে থাকবেন। নাঃ, কাল থেকেই তুমি ভিন্ন হয়ে যাও।

তাই হবে।

কাল থেকে ভিন্ন রান্নাঘরে ভিন্নভাবে লক্ষ্মী তার আর খোকার জন্য রান্না করবে, এটা তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। বাড়িতে সে একবেলা খায়। দশ জনের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া তার অভ্যাস। সেটা বাইরে হোটেলে সম্ভব হয়, বাড়িতে ভাইরা তার সঙ্গে খায় না। সময় মত দু'একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে আসন পেতে সবার সাথে খেতে বসে গিয়ে সে দেখেছে, খাওয়া যেন মাটি হয়ে গেল ভাইদের, পরিবেশন উদ্ভট হয়ে গেল মেয়েদের, লক্ষ্মীর পর্যন্ত! পরে লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে কেঁদে বলেছে, কেন তুমি বসতে গেলে ওনাদের সঙ্গে? আমি গলায় দড়ি দেব!

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সামনে পড়ে সুজিতের বৌ সুমনা। পাশে সরে দেয়াল ঠেলে সরিয়ে দশ-বিশ হাত ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টাটা সুমনা এমন কুৎসিতভাবে করে যেন গুণ্ডার হাতে মান বাঁচাতে ভদ্রমেয়ে সতী বৌ ইটের কবর চাইছে। আবার চাকরী গেছে সুজিতের। সুমনার স্নায়ুগত ব্যারামটা মাসখানেক হল আবার বেড়ে গেছে শুনেছিল লক্ষ্মীর কাছে, বোধ হয় মাসখানেক সুজিতের চাকরীর মেয়াদ আছে এটা টের পাওয়ার পর। আগের বার যখন বেকার ছিল সুজিত, সুমনাকে

দিয়ে সে মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে পাঠাত তার কাছে। পাঠাত লক্ষ্মীর কাছেই কিন্তু সুমনা টাকার দরকারটা জানাত তাকে, বলত, দাদা, দশটা টাকা চাইতে এসেছি। মেলামেশা ছিল তখন তাদের মধ্যে। সুজিতের চাকরী হবার পর সে আর সুজিত দু'জনেই কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার বেকার হয়েছে সুজিত। কিন্তু এমন করে কেন সুমনা তা হলে? হিসাব মত আবার তো সুমনার এখন দাদা বলে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করা উচিত! অনেক টাকা কি ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছে সুজিত? রক্তে আগুন ধরে যায় অজিতের, হাসি পায়। মেয়েটার পরিচয়হীন পেট মোটা কোমরে একটা লাথি কষিয়ে দেবার সাধটা সে দমন করে।

বলে, ভীষণ মদ খেয়ে এসেছি। ভয়ানক খুন চেপেছে।

মাগো! সুমনা আর্তনাদ করে, আর্ত মৃদু অস্ফুটস্বরে, সে নিজে আর সামনের খুনেটা ছাড়া কেউ যাতে না শুনতে পায়!

এক মুহূর্তে নিজের কাছে ছোট হয়ে যায় অজিত। এইসব বিকারের বস্তা, খাপছাড়া দুঃখী জীব—এদের ওপর সে রাগ করে!

অজিত বলে, বৌমা, ওষুধ খাও নি?

সুমনা বলে, খেয়েছি তো?

অজিত বলে, না খাওনি। এখুনি ওষুধ খাবে যাও। বোনটি আমার, মা'টি আমার, ওষুধটা রোজ খেতে হবে।

সুমনা কেঁদে ফেলে, জলকাচা মোটা শাড়ীর মত, মোচা কাটা কলাগছের মত, অঝোর ঝরে কেঁদে ফেলে, দাদা ওষুধ খেলে ঘুম পায় যে? রাগ করে যে ঘুমোলে?

অজিত সটান ওপরে চলে যায়। এ সমস্যা তার ধরাছোঁয়ার এলাকায়

সমস্যা নয়। সমস্যাটা স্পষ্ট হতে দিয়ে বরং বোকামিই করে ফেলেছে সে। যার শোচনীয় দুঃখে হঠাৎ মনটা মায়ায় ভিজে গিয়েছিল, কাটখোট্টা বাস ড্রাইভার হলেও ভদ্র হালদার পরিবারের ছেলে বলেই হয়তো,— সে হয়তো সিঁড়ি কটা বেয়ে নামতে নামতেই সুর পালটাবে। সরু গলার চিকণ আওয়াজে চিরে দেবে সেঁতসেঁতে উঠানের গুমটো নিশ্চল বাতাসকে, বলবে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় মেজো ভাসুর গায়ে তার হাত দিয়েছিল, ইস্, মদের কি গন্ধ তার মুখে!

এসব ভদ্রঘরের মেয়ে বৌকে বিশ্বাস নেই!

জামা ছাড়ে অজিত। লক্ষ্মী সামনে এসে হেসে বলে, ওমা, আজ যে এত সকাল সকাল এলে?

অজিত আরেকবার অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু আশ্চর্য নয়, অবাকও হয়। লক্ষ্মী তার সঙ্গে হাসিমুখে ঘরোয়া অর্থহীন কথা বলেছে, শাড়ী গয়না ক্রিম পাউডার কিছু তার আজ আনবার কথা নয়, আনেও নি জানে লক্ষ্মী।

ইস্! মুখটা শুকিয়ে গেছে তোমার। জামা-কাপড় খুলে লুঙ্গিটা পরে এসে বসো। একটু হাওয়া করি। ঘেমে নেয়ে গেছ একেবারে।

বাড়ি এসে জামাকাপড় ছেড়ে রোজ সে লুঙ্গি পরে। এ প্রক্রিয়া লক্ষ্মী তাকিয়েও দ্যাখে না। আজ লক্ষ্মী অনুমোদনের হাসি হেসে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে বসে হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা ঝাঁকায়।

কি বলছ? জিগ্গেস করে অজিত, আপশোষের সুরে।

ওমা! ন্যাকা যেন! মিষ্টি কথায় গরম বাড়ে। কেন, কি অপরাধ করেছি আমি? ভেসে এসেছি নাকি?

লক্ষ্মী কাঁদে। ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে, বাইশ টাকার তাঁতের

শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে, বাঁকা হয়ে বসে লক্ষ্মী কাঁদে। অজিত মনে মনে বিবেচনা করে যে ফুলবিবির রেশনের সস্তা ছাপা শাড়ী পরে পরে খুলে খুলে তাকে ভুলবার চেষ্টাটা এর চেয়ে অনেক ভদ্র ছিল!

খোকা ঘুমিয়েছে। সারাদিন দুষ্টুমি করে এইমাত্র ঘুমোলো। এত দুষ্টু হয়েছে কি বলব। খেটে খেটে মরলাম। তুমিও তাকাও না আমার দিকে।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মগভরা জল নিয়ে বারান্দায় মুখ হাত ধুয়ে অজিত গম্ভীর মুখে বিছানায় এসে বসে একটা বিড়ি ধরায়। তোমার নাকি দুশো টাকা মাইনে হয়েছে দোতালা বাসে? লক্ষ্মী শুধোয় পাশে বসে, তার বাঁ হাতে বিড়ির আগুন জলছে বলে ডান হাতটা টেনে বুকে রেখে।

তার মাইনে নেই, কমিশন ব্যবস্থা। কিন্তু মাসকাবারি বাঁধা মাইনের হিসাব ছাড়া এরা বোঝে না। অজিত বলে, মাসে তিনশ' চারশ' দাঁড়াবে সবশুদ্ধু।

ওমা! কোথায় যাবো! লক্ষ্মী যেন মূর্ছা যাবে। মূর্ছা যাবার বদলে সে খানিকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকে অজিতের বুকে। তারপর বলে, ঠাকুরপোর চাকরী গেছে জানো?

তাই নাকি?

চেপে রেখেছিল কথাটা, তা এ কি আর লুকোনো যায়? সুমির রকমসকম দেখেই আমার সন্দ' হচ্ছিল।

অজিত নীরবে হাই তোলে। একটা বিড়ি ধরায়।

এসো না। শোও না দুদণ্ড। খেটেখুটে এসে কি বিশ্রাম করতেও সথ যায় না একটু? আস্তে আস্তে ঘামাচি মেরে দি, কি ঘামা

হয়েছে মাগো। ইস! মাগো! আর শুনেছ? বাবা বলছিলেন, ভাসুর ঠাকুর সংসারে পঁচিশ টাকা কম দেবেন বলেছেন। ওঁর নাকি নিজের খরচ বেড়েছে। ঠাকুরপো তো ছাঁটাই। বাবার কাছে নাকি দু হাজার টাকা চেয়েছে, ব্যবসা করার জন্যে। ঠাকুরপো করবে ব্যবসা! বৌ যার রোজ কাঁদে যে এর চেয়ে একটা হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে—

বিদ্যুতের আলোয় ঘর স্পষ্ট, আসবার স্পষ্ট, মানুষ স্পষ্ট, দৈন্য অভাব অভদ্রতা সব কিছুই স্পষ্ট।

অজিত বলে, খিদে পেয়েছে।

ওমা! মাগো! খিদে পাবে না?

খাওয়ার আয়োজন করতে করতে লক্ষ্মী বলে, বাবা বলছিলেন, যাই হোক তাই হোক, আমার এই ছেলেটাই ভাল। সংসারে ঠিকমত টাকা দেয়, নিজের আর বৌয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না।

বারান্দায় কেউ নেই, আশেপাশে কেউ নেই, তাদের ঘরোয়া প্রেমালাপ শুনবার মাথাব্যথা কারো আছে কিনা সন্দেহ, তবু অজিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে লক্ষ্মী ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা আমায় বললেন, ছেলেদের মধ্যে তুমিই শুধু বিশ্বাসী। ওসব বাবুদের ওপর মোটে ভরসা নেই বাবার। বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরবেন ওদের ভরসায় থাকলে। তোমাকে ভিন্ন করিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চান বাবা। যা করা উচিত, তাতো তুমি করবে অন্ততঃ, মুখ্যু হও আর যাই হও।……তিন চারশ' টাকা। ভাসুর ঠাকুর আড়াইশো মাইনে পান, তাতেই দিদির এত গর্ব। তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড় তো ভাসুর ঠাকুর!

টিচার

রাজমাতা হাই-স্কুলের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবে-চিন্তে শেষ পর্য্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয় কম, তার ওপর এই সব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় ক'দিন আরও ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্ম্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকী থাকে বলে, এটা-সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরী করতে! বাপের জন্মে রায় বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তার স্কুলে এ সব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না। দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন্ মাথা-পাগলা ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিতেন অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলা দেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বাঁধছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না লেখা ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুসী করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ও-সব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ও-সব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসি মুখে বহন করে, বিত্তানের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর-ধাঙ্গড়ের মত হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায় বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরণের সদুপদেশ রায় বাহাদুর শোনাল শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, দমক-গমক-মূর্চ্ছনা আমদানী করে, গুরু-গম্ভীর চালে।

আপনারা কি বলেন ?

কে কি বলবে ? সকলে চুপ করে থাকে। রায় বাহাদুরের ধৈর্য্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম এক ফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয় তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায় বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপ-চাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেড-মাষ্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, আজ্ঞে, তা বৈ কি। শিক্ষক-জীবনের মহান্ আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, গত মাসের বাকী মাইনেটার জন্য একটু, যে-রকম দিন-কাল, সংসার চালানোই—

কে উস্‌কানি দিচ্ছে জানেন?

ক'বছর আগে হলে শশাঙ্ক হয় তো দু'-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্ক বাবুও আর সে শশাঙ্ক বাবু নেই, অনেক বদলে গেছে।

আজ্ঞে, উস্কানি কে দেবে। একজন দু'জনের উস্কানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশ জুড়ে এ-রকম চলছে।

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায় বাহাদুর বলে, গিরীন খুব পলিটিক্‌স করে বেড়ায় না কি?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কের, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, পলিটিকস্‌ করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয় তো কখনো শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিকস্‌ নিয়ে কিছুই হয় না।

হয় না? সেদিন ষ্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?

আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেষ্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় ষ্টুডেন্টদের ওপর গুলী চালান হল, তারই প্রোটেষ্টে—

কলার কাঁদিটা বাতভি হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলে পেকে যাবে দু'-এক দিনের মধ্যে, কি বলেন?

কাল মালীকে বলব।

রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন! রায় বাহাদুর হাসল।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায় বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে :

শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাকে জানিয়ে দিয়ে যেতে যে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয়, তবে ভালই।

গিরীন কিন্তু ও-সব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায় বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারে, তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্ট ভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায় বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাতে থাকবে, তাকে চটাবে না।

অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ। কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ও-সব। রায় বাহাদুর অমায়িক ভাবে হাসে।

আপনাকে পায়ের ধূলো দিতেই হবে।—গিরীন বলে নাছোড়-বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, সকাল সকাল গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড়ই আঘাত পাব না গেলে।

রায় বাহাদুর যেতে রাজী হয়েছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্ততঃ করে গিরীন আবার বলে, একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোন কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারো কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা না তার বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্ব্বনাশ হবে।

বলো কি হে?

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায় বাহাদুরের। এবার একটু ভেবে, গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজী হয়ে বলল, এত করে যখন বলছ—

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায় বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয়!

প্রায় দশটায রায় বাহাদুর গিরীনের বাড়ী পৌছল। বাড়ী দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরও বেশী। এত ছোট এত পুরানো এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ী হয়, রায় বাহাদুর জানত না, কারণ, এর চেয়েও খারাপ বাড়ী চারি দিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনটার দিকে কখনো তাকিয়ে ভাখেনি—এ ধরণের বাড়ীর অধিবাসী কস্মিন্ কালেও তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি! ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমত একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যাণ্ড বেজেছিল, মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত শানাই বাজায়। লোক গিজ-গিজ করে তার বাড়ীতে, ছেলের বেলা বেশী হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজ-গিজ করে। গিরীনের বাড়ীতে লোক আছে বলেই মনে হয় না, ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ীর আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙ্গা তক্তপোষে বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মত দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবু-থবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোমওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোষ ছাড়া বসবার আসন আছে আরেকটি, কেরাসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা-মশারির বাণ্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তপোষের নীচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি।

ইনি আমার বাবা, গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, দু'বছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেণ্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশো টাকার ব্যাপার।

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কি বলে ভাল বোঝা যায় না।

আসুন। ভেতরে চলুন।

রায় বাহাদুরকে গিরীন বাড়ীর মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে রায় বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়ীতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ীর ঝিয়ের মতই, তবে রায় বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়ীরই কোন বৌ-ঝি।

ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায়ে ব্যান্নুন নাড়ায় রত বৌটির শাঁখা-পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কি করে যেন রায় বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বৌ।

চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দু'খানা—রান্নাঘরের চালাটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায় বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, নড়া-চড়ার স্থান কতটা, কি রকম আলো বাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরানো কার্পেটের আসনে বসে রায় বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোট ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

কে কাঁদে?

ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত। জ্বর আসছে বোধ হয়, জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।

রায় বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার! গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ্য করে, ফাঁদে পড়া সিংহ জন্তুর দিকে শিকারী ব্যাধের মত শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে, মুখ তার থম থম করে মনের অপোষহীন মনোভাবে।

আপনি তো ভাল হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাশ করেননি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।—সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে।—ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।

রায় বাহাদুর যেন রাজী হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনি ভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, শুনছো? খোকাকে নিয়ে এসো শীগ্‌গির। আঃ, এসো না নিয়ে? দেরী করছো কেন?

নিজের অতিরিক্ত অধৈর্য্যের কৈফিয়ৎ দেবার জন্যই যেন রায় বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা! সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ী, এক ঘণ্টা লাগাবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি!

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো সুরু করতে না করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি বৌ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, এক নজর তাকিয়েই রায় বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়ীটি সে পরে আসেনি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে দেখেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বৌয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছু-পিছুই বৌটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে রায় বাহাদুরের। তার ভয় করে।

ও, তুমি এসেছ, গিরীন বলে নির্ব্বিকার ভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায় বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ-করা দামী চকচকে জুতো পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বৌ তার ইতস্ততঃ করে, বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বৌটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায় বাহাদুর। তার বাড়ীর মেয়েরা, ফুলি ঝিটা

পর্য্যন্ত, যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নীর কথা ধর্ত্তব্যই নয়, তিনি প্রায় গোলাকার। তার মেজ মেয়ে আর মেজ ছেলের বৌ রোগা ছিপছিপে, বড় ছেলের বৌটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজ কাল মুটোচ্ছে ' গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বৌটির সঙ্গে মিলিয়ে রায় বাহাদুর বুঝতে পারে, তার মেয়ে-বৌদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশী মেদ-মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নীরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভাল লাগে রায় বাহাদুরের, এত তাঁর ইচ্ছা করে টিপে-টুপে ছেনে-ছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে!

কি করছ?—গিরীন বলে বৌকে অনুযোগ দিয়ে, ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধূলো ছোঁয়াবেন, আশীর্ব্বাদ করবেন, ওষুধ দেবেন।

না! না! রায় বাহাদুর প্রায় আর্ত্তনাদ করে ওঠে, আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভাল চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভাল ডাক্তার দেখাও।

বিনা ফি-তে কোন্ ডাক্তার দেখবে বলুন? গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায় বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিম-ঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর ঐই বর্ব্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কি করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী খুনের খপ্পরে এসে পড়ে কি বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাতে যে ভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে

বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায় বাহাদুরের মজ্জাগত। রায় বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক মুহূর্ত্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর মুখ তুলে বলে।—

মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বৌমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মত। তোমার কোন ভাবনা নেই বৌমা, ছেলে তোমার ভাল হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এখুনি গিয়ে বোস ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফল-টল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মত মানুষ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে রায় বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ—?

আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের যে দু'গাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েক জনকে বলব, স্কুল-মাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তারপর ভাবলাম, ছেলের মুখে ভাতে শেষ-সম্বলটুকু খোয়াবো, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও-মাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে!

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায় বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়েছে অনেক বার, নিজে বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুস্কিল আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরণটা

ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছেন না গিরীনের। নিজের দুর্দ্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে, এমন টিট্‌কারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে? কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ী টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায় বাহাদুরের! তার স্কুলের একজন টিচার কি এত বড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না এভাবে তার কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ আদায় করা যায় না, এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাবে গলার সুরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায় বাহাদুর বলে, তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভাল পড়াও শুনেছি। আর বাকী মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, তা করবেন না স্যর। লোকে বলবে ছেলের মুখেভাতের ছলে আপনাকে বাড়ীতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকী মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না স্যর!

চোখের পলক পড়া আটকে যায় বাহাদুরের, ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারীর সকরুণ আবেদনের মত এতক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবী-

দারের শাসানির মত ফুঁসে উঠেছে! উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায় বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও-ঘরে জরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে কিন্তু সেও যেন ভয় দেখালো রায় বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাকে!

তাকে আরও শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরও হ'জন এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

ত্যাখ গিরীন ত্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড ত্যাখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে!

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত্ত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

আমি এবার উঠি গিরীন।

একটু বসুন।

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি-চুপি ডাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরা আপেল ও শশা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে আসে। বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেক দিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টি অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মত কেটে গিয়েছিল

রায় বাহাদুরের। নীরবে সে দু'-এক টুকরা ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। রায় বাহাদুর এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায় বরখাস্তের। নোটিশ সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায় বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায় বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

ছিনিয়ে খায় নি কেন

দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায় নি। কেন জানেন বাবু?

একজন নয়, দশজন নয় শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হ'য়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে ময়লার ভুর হাতড়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায় নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমুল তরিতরকারী, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন, লুকানো গুদোমে চালের পাহাড়, বড় লোকের ভাঁড়ারে দশ বিশ বছরের ফুড—ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁৎকা গায়ের হোঁৎকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরীবের মুখে না উঠে যে চালডাল তেলনুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হাঁ, মাছ-মাস, দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিষের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কি ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হত।

শুধু চাল—কাঁড়া, আকাঁড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেলনুন এসব দশটা জিনিষ তো চায় নি যারা না খেয়ে মরেছে! শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্ম মাথা না ঘামিয়ে।, গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দু'টি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত কেলিয়ে যাক, ধুক ধুক প্রাণডা নিয়ে জীয়স্ত থাকে।

চালার বাইরে ক্ষেতখামার আম-জাম কাঁঠাল ঘেরা খড়ো ঘরগুলিতে বেলা শেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক, আড়াল খোঁজে নি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসে নি। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে খেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কুনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাট মোটেই মেলে নি তার সঙ্গে। বেঁটে খাঁটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্য্যন্ত নেই। জেলে হয় তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদম ছাঁটা করে, এখনো বড় হবার সময় পায় নি।

এদেশের রণ-পা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ী ডাকাতি করতে যাওয়া বড় লোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরীবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালী, ধূর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনীতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁত-কপাটি লাগত, হুঙ্কার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হ'ত স্ত্রীলোকের। বড় লোকের টাকা লুটে তারা গরীবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথে ঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগ মত চুরি ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশী খালে সরকারী চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু'বছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, মরছে তবু ছিনিয়ে খায় নি কেন—যে কথা বলছিলে।

ও, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায় নি, শুধু আমি, একমাত্তর আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মত অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা সেটা বলেন, বড় বড় কথা। আবোল তাবোল লম্বা চওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক! বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু, বলবেন কি! এক বাবু বললেন, বেশীর ভাগ তো গরীব চাষী, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোন কালে বে-আইনী কাজ করে নি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে না বাবু? সাধ যায় না চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কাণডা মলে

দিতে? বে-আইনী কাজ, বে-আইনি! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেবে করেছে কাজটা আইনী না বে-আইনী, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার। মেয়ে বৌকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরী মর-মর সাথীর গলা টিপে মেরে ফেলছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন! আরেক বাবু বললেন, ওটা কি জান যোগী, ওরা সব মূখ্য গরীব, চাষা-ভুষো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কি —এই ভেবে মরেছে না খেয়ে, লুটে পুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে নি। শুনেছেন বাবু কথা, আঁত-জ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসে সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত-পা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয় নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বৌ, বোন শুদ্ধ? ছুটে যায় নি সহরে, বাবুদের রিলিফখানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি? আরেক বাবু বললেন—

বাবুরা কি বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বল।

শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কি? না, আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি,

জমিজমা তো চিরজন্মোই বেচে আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড় আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস! আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিস। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরাণো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয় নি।

বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দু'টো কি তিনটে দোকানে। সাতদিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড়কুলি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয় তো মিত্যু নির্ঘ্যস। অত সব নয় নাই জানলো, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানী দূর দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য যায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন 'কত দেখেছি, সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট করতে কি ওরা জানতো, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি

আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।

ডাকতেছ ?

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালাপেড়ে কোরা শাড়ী পরা ঢ্যাঙ্গা একটি যুবতী। মনে হল, যোগীর উদ্ধার করা মেয়েদের একজন নয় তো ? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দু'বছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

তামাক দে।

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

আমার পরিবার—যোগী বলল, হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে একমাস দেড়মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জ্যোৎস্না তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা বলছিলাম বাবু। সর্বোনাশা দিনগুলির কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বর্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পথে ঘাটে মরছে দেখে মনে বড় কষ্ট। আর গায়ে বড় জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা' জোতদার, নন্দ আড়তদার সরকারী কত্তা করিম সায়েব, পুলিন বাবু এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কোলকাতা গিয়ে পর্য্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলিয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে ? গরু ছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে ক্ষেতে ঢোকে,

মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কি? ধান-চাল লুট করি দু'এক যাগায়, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু'চারজনকে নিয়ে নিয়ে লুটে পুটে ক'টাকে খাওয়াবো? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোন কালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকোবো না, মাঝে মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকা-পয়সা, গয়না-গাটি, মারধোর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারি নি বাপের জন্মে, বাপ যদি জন্মো দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙ্গে দিয়েছি ফের। টাকা পয়সার বদলিতে ধান চাল লুটের জন্য দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার পেল না দু'জন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধান চালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাসা করছি ওদের সাথে। দু'জন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সী, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দু'জনকে নিয়ে মোটা দাঁও কি মারব বলুন, ছুঁক ছাঁক দু' দশ মণ আলতো পেলে কেড়ে নি, বিলোতে গিয়ে সুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া-চামচিকে, ক'জনকে দেব আমি? ভাবলাম দুত্তোর! এ সখের কেরদানি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দু'মুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয় তো ফল হবে কিছুটা। না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে, আমার গরজ! না, কি বলেন বাবু?

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কল্কে এনে দেয়। কল্কের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোন ছাপ চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

সেই থেকে বসে আছেন, যোগী বলে কল্কেটা হুঁকোয় বসিয়ে, তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরীবের ঘরে। তুটো চিড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া ?

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভব করে বলি, খাব না ? এতক্ষণ বলতে হয়! জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কি ব্যাপার, মুড়ি-চিড়ে কিছু কি ঘরে নেই যোগীর, খেতে বলছে না! যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করিনি একটা দিন দু'চার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাশের সাথে কি মিশ খায় মোর! আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোথেকে এল। ঝোলের মত ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটা-ছেলে মোকে দেখলেই বলে, হারামজাদা তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা! মেয়েছেলে দু'একটা দেখে শুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সঙ্গতি আছে অন্ততঃ দু'চার বেলা খাবার— চুপি চুপি সার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে সহর ঢুঁড়তে বেরুবার সময় হয় তো বা দেখে ফেলতে পারে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে ক'টার রকম

দেখে। মেয়েছেলে! হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধ ওঠা চুলের জট খ্যাপার মত চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গর মত শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মত, খোঁচানো হাড্ডি। আর কি দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মত। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া যোগাড় করা পেট ভরে!

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিড়ার মোয়া আর ছোট খাট নৈবিদ্যের মত নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙ্গা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোট নিটোল মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর ওর দিকে তাকিয়েই।

বলে, বাবুকে কি রাক্ষস ঠাওরালি নাকি, অঁ্যা? দুটো মোয়া, দুটো নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কি হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসী থেকে জল এনে দে ঘটিতে। একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ৎ সে বলে তার পরিবারকে, মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।

মাছের তরে মরছি! বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝঙ্কার দিয়ে।

সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছো তো, মোদের খিচুড়ি ভোগের জন্যে যে চাল ডাল আসে তাও বেশীর ভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে

খিচুড়ি এমন নুনজলের মত লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কত্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব! কেড়ে খাই এসো। এমনি ভাবে কত করে কত রকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কাণ দেয় না কথায়। কাণ দেয় না ঠিক নয়, কাণে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, আঁা, আঁা, কি বলছিলে? বলে আবার ঝিমোয়। জলো খিচুড়ি একচুমুকে খাবার খানিক পরে যদি বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না খেয়ে মরবে এ ভারি অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগু পিছু নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে, ছোট এক মগ সেদ্ধ চাল ডালের ঝোলের জন্যে,—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারো উৎসাহ দেখি না।

একদিন খপর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটামত সরকারী চালান আরেকটা এয়েছে অ্যাদ্দিন পরে, সাত দিন কেন পুরো আধ মাস সাত্য-কারের ঘন খিচুড়ি বিলোনো চলবে। কিন্তু দেখে শুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশীর ভাগ চলে যাবে চোরা বাজারে। সদরে জানা চেনা লোকে ছিল ক'টা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করব না, সহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা, বজ্জাত, চোর-গোপ্তা ছোরা মারা গোছের লোকের সর্দার ক'জন আর কি। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারী বে-সরকারী বড় কত্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর ক'বছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু'দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাত্তর।

ওর মারফতে আর দু'চারজনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাঁওতা মেরে কাণ্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইষ্টিসানে। চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। চালানী চাল ডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি !

বল্লে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলু সেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই ! আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ্ শালার ব্যাটা শালা। আর— এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কাণে তোলে নি, দু'টো দিন দু'বেলা এক মগ ঘন চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্দ খেয়ে সকলে কাণপেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দু'বেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই ক'জন নিজে থেকে আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল-ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজী, নিজেরা রেঁধে-বেড়ে খাবে : আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কি ভাবে কোথায় কি করতে হবে গুদোম থেকে মাল পত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

কি বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কি, এমন আবোল তাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওলা জমিদারের বাড়ী হামা

দেবার আগে যেমন ভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনি ভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে দেওয়াটা ক'দিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারী লরীতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রঙ করা জলো খি ড়।

তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ' দেড়েক মাগীমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধান-চাল। বাচ্চাগুলো পর্য্যন্ত তড়পাতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ সা'র গুদোমে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগ-বাঁটোরায় মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিশ টদিশ নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দু'টো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কিভাবে কি মতলব করেছি সা'র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এলো কেমন মন-মরা ঝিমোনো মতন।

পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জলো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মসগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই!

সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত

খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায় নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু'চার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু'দিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চয্যি কি। এতো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শাস্তরে বলে নি বাবু, অন্ন হল প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয় না বলদ জমি চষে? কয়লা না খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ী টানে? মাহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না খেয়ে না খেয়ে তপ করেন, একদিন ত্মাখেন কি, গর্তের মুখে পুতুল মত জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়-গুলি দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কি তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলি বললে, বাপু মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা ত্মাখো—নীচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারাল দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্মো মশায়। বিয়ে কর, পত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজ-ভোগ খেয়ে পুষ্টু মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার প্যারে। বছর কাটে দুটো-তিনটে, গব্ভো হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, একি কাণ্ড বল তো বৌ, তুমি বাঁজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝঙ্কার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনু গিয়ে তপস্যা করবেন, একরাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে করা বৌয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না

কেন, বৌ তুমি বাঁজা নাকি! নজ্জা করে না? না খেয়ে না খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছো, শক্তি নেই, খ্যেমতা নেই, বৌকে বাঁজা বলতে নজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝে নি, সেটা চট করে বুঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি, লুচি-মাংস, পোলাও কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বৌ—

রাত হয় নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ? যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্য কি মিথ্যা জানি না মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জ্যোৎস্নায় গেঁয়ো পথে চার মাইল দূরের ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না খুব কম করেও ক'টা মাস অন্ততঃ লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর আলের বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচা মাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়তে যাই। যোগী সামলে সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাব নিকাস বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ-নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল

থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুসী হতে নারাজ যে বৌ তার যে ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজে বাজে খেয়ালে—যে সব খেয়াল তাদেরি মানায়, তাদেরি ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা বাপ ছেলে মেয়ে,—অনর্থক অখুসী হতে রাজী নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো! তারপর আর কোন কথা আছে?

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেণ, ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেণ। সে কেরাণী। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশো টাকায় সুরুর গ্রেডে সরকারী চাকুরী পেয়েছে আর বছর। হীরেণ সাতান্ন টাকার কেরাণী, যুদ্ধের দরুণ পাঁচ দশ টাকা বোনাস এলাউন্স বুঝি পায়। হীরেণকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু সরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরী বাড়ীটাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাজার করে রেঁধে বেড়ে, ঝি চাকর ঠাকুর রেখে, শুধু নিজেদের ভালমন্দ সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মত তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি, দু'পলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসার থেকে ও সংসারে দান হিসাবে নয়। দু'চার দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারের মাল আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বড় দু'ভাই-এর বৌদের তরফের কোন আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোন উপলক্ষে খাবার টাবার মাছটাছ এমন কোন জিনিষ যদি এত বেশী পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাৎতিটা ভাগ করে

দেওয়া হয়। হীরেণদেরও দিতে হয়। কেরাণী বলে তার বৌ এসেছে গরীব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ীর দিক থেকে কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মত, কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মত, কখনো আসবেও না, তবু উপায় কি। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মত বাস করুক, বাস তো করে একই বাড়ীতে, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শী সকলে। সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোন মতেই।

বিশেষত বুড়ী মা আছেন হীরেণের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তাঁর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া, দইটুকু পেতে রাখা, চাল ডাল তরকারীটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এসব করতে হয় হীরেণের বৌকে। অসুখে বিসুখে ব্রতপার্বণে বাড়তি দরকারে অন্য বৌদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজ-কার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেণের বৌ-এর কাছ থেকে। তাঁর রেশন কার্ডের মাল হীরেণ পায়, মাসে দেড় মণ দুমণ কয়লার দাম তিনি দ্যান, ঠিকা ঝির আট টাকা বেতনের দু টাকা দ্যান আর সাধারণ-ভাবে সংসার খরচের হিসাবে দেন দশ টাকা।

হীরেণ ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমত আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পশার বেশী, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পশার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা। চাকরী হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড় বৌ-এর পরামর্শে দায়টা মাসিক পঁচিশ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের বৌ নেই। এখনও বিয়ে করে নি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়ীতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিল নীরেন, লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড় দু'জনকে। তখনও তার চাকরী হয় নি। তার খাওয়া পরা, পড়াশোনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরও তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথাটাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এরকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেণ তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, কেন, এত ভালই হল? রোজ বিশ্রী খিটমিটি, ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কি মন কষাকষি বলতো? দাদার আয় বেশী, তিনি ভালভাবে থাকতে চান। মেজদার ভাল উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব, ওঁরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়া-খাওয়ি কামড়া-কামড়ি করেও এক সাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভায়ের বদলে ভদ্রলোকের মত থাকাই ভালো।

তোমার চলবে?

চলবে না? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্য দিকে লাভ হবে। মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুঁদকুড়ো হজম হবে।

নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন!

অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে কিনা কথাটা হল এই যে—

দুঃখী অসহায় গরীব কেরাণী ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড়

দু'ভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরও পড়েশুনে আরও পরীক্ষা পাশ করে বড় কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরীর চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেণের সংসারে।

চাকরী হবার পরেও, দুশো টাকায় সুরুর গ্রেডের সরকারী চাকরী হবার পরেও, প্রায় দু' মাস হীরেণের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়বৌ পুলকময়ী আর মেজবৌ কৃষ্ণপ্রিয়া চটপট অদল-বদল করে নিজের নিজের সংসার সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সার্বজনীন ভাঁড়ার ঘরটা ভেঙ্গে-চুরে নতুন জানালা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো আলো-বাতাস ভরা বড় আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণপ্রিয়ার আপশোষে। সে যদি চেয়ে নিত ভাঁড়ার ঘরটা রান্নাঘর করার জন্য! উনান টুনান বসানো নতুন তৈরী রান্নাঘরটা পেয়ে সে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারেনি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাঁড়ার ঘরটাকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে! সেজবৌ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে পুরানো নোংরা রান্নাঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত্ত, কালি-ঝুল মাখা চুণ-বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়, মিস্ত্রী লাগিয়ে কিছু পয়সা খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বড় বৌকে হারাণো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, [illegible] বেড়ায়, নিন্দে করে কেরাণী দেওর আর তার বৌয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, কৃষ্ণপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও

শাড়ী কেনে বড় বৌয়ের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায়, অর্গ্যান বাজিয়ে গান করে, কেঁদে কেটে চিঠি লিখে ঘন ঘন বড়লোক মামা-মামী মামাতো ভাইবোনদের দামী মোটরে চাপিয়ে বাড়ী আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফর্সা রঙ আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাষ্টারণীর মত পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে বৌয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে যায় শাশুড়ী ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু, পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পশার বড় বেশী বেড়েছে, দু' টাকার বদলে আট টাকা ফি করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামী আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ী গয়না, মোটর কিনেছে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, জমি কিনেছে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, জমি কিনে আয়োজন করছে বাড়ী করবার। ধীরেনেরও ওকালতিতে পশার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পশারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবে চিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশো পাঁচশো টাকা আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করে নি, বৌ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত হয়ে ছিল। হীরেণের সংসারের অশান্তি, উদ্বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মা'র গুমখাওয়া এক গুঁয়ে সেকেলে ভাব, জীবনে তার বি[illegible] এনে দিয়েছে। প্রায়ই তাকে বাজার করতে হয়, প্রায়ই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে

হয় ষ্টেশনের লাইনে, মার আবদার আর হুকুম সমানে চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড় ভোঁতা, বড় নোংরা। বড় বৌ আর মেজ বৌয়ের প্রায় চার বছর পরে বৌ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী, তার ছেলে মেয়ের সংখ্যা ওদের দুজনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাঁধছে বাড়ছে ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ী শাশুড়ীর সেবা করছে, গাদা গাদা জামা কাপড় সিদ্ধ করছে, কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছে : মরলে জুড়োবো, তার আগে নয়। ঘর সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরানো বাক্স পেঁটরা, রঙচটা খাটচেয়ার, ছেঁড়া কাপড়-জামা, ময়লা কাঁথাকানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে পারে। রান্নাঘর ধোয়ায় দু'বেলা—নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না করা ডাল ভাত মাছ তরকারী খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ !

ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে রেঁধে খাওয়াবো।

কৃষ্ণপ্রিয়া বললে একদিন হাসি হাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলি খারাপ।

এমন আগোছাল কি করে থাকো ঠাকুরপো ? ছি ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নীচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কি ছড়িয়ে ভড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ মাসে মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরুত করে দিতে পারে না তোমার ?

তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে কৃষ্ণপ্রিয়া, ঘর া সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে

এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পারে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুসীই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কি আছে!

খেয়ে আরও খুসী হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিষ শুধু কৃষ্ণপ্রিয়া রেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি ঘাঁটা কোন মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার সেঁতসেঁতে ঘরে পুরানো মলিন পাত্রে মোটকাহীন মরচেধরা টিনের কৌটার মসলায় রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা, পরিবেশক মাইনে করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরে সুস্থে হাসিগল্পের সঙ্গে এক সাথে খাওয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ওদিকে এতদিন পরে হীরেণ আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরও কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, আমি টাকা দিতে পারব না! যা দিয়েছি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।

হীরেণ বলে, তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কি করবি অত টাকা দিয়ে?

যাই করি না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেক ভাবে।

ছুটির দিন একটু দেরী করেও খেতে পারব না খুসীমতে?

ঠাকুর রেখে দাও, যত খুসী দেরী করে খেও। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো? দেখতে পাওনা সেই কোন্ ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি? দেড়টা বাজে, এখনো বলছ রান্নাঘর আগলে বসে থাকতে?

আমি যে টাকা দিই—

টাকা দাও বলে বাঁদী কিনেছ আমায়?

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলি করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেণও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোট ভাই-এর মত ব্যবহার করে তার সঙ্গে! মাসে মাসে এতগুলি টাকা সাহায্য করে ওর সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টিসুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয়, অনুগত নয় দু'জনে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে, ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেইজন্যেই তো তাকে বেশী করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেণকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ী মাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ো কি খাবে ও টাকাটা? হীরেণ-কেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা একরকম সে হীরেণকেই দিচ্ছে! সোজা-সুজি আরও দেবার কি দরকার আছে কিছু? না সেটা উচিত? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের!

তলে তলে টাকা জমাচ্ছে! বাইরে গরীবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো?

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকার ভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলি, ব্যাঙ্কের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করেনি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলি দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায়! কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায়!

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হল, পৃথিবী জোড়া মহাযুদ্ধ থেকে সুরু করে তাদের পরিবারিক যুদ্ধের পর্য্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমিটাতে এবার বাড়ী তৈরী আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইট বালি চুণ সুরকি পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেণ্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলা দেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমত, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায়নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ীর কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবারও যো নেই আমার! দুর্বল ক্ষীণ স্বরে বুড়ী মা কাতরিয়ে কাতরিয়ে আপশোষ

করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্য রকম শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, আমি মরলে তো না খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিশুদ্ধ ?

হীরেণ বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণ দুর্বল সুরে বলে, কেন অত ভাবছ বলত মা ? অত সহজে কি মানুষ মরে ? দুর্ভিক্ষে ত্মাখোনি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে ? তুমি এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাঁচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে ? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো' দুধ, হপ্তায় দুদিন একপো মাছ, তাও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার পয়সার পুঁই শাক রেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বৌটা বাঁচবে, ছেলে-মেয়ে কটা ও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, একথা সত্যি, এভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না।

কি বল্লি ?

বল্লাম বাচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব ? সাহেবের টুঁটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন ? মরব না। কেউ আমরা মরব না।

বুড়ী মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে এবার মরলে কেমন হয় ? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে, চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফি'র ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেণের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ী গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিন্ত নির্ভর চালচলন, অবসর সৌখীনতা, ভাল ভাল জিনিষ খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সব কিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত

করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে সে এই ভাবনার মলম দিয়ে সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা ওরকম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে জীবনপাত করে খাটা, শাক পাতা ডাল ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজর গজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেণের ওপর ঝাঁঝ ঝেড়েছে শুধু স্বামীস্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলে-মেয়ের দুটি বড় হয়েছে, তারা শাকপাতা ডাল-ভাত খেতে পারে, অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু, কিন্তু একটুতো দুধ চাই? একপো দুধ আসত, সেটা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুদিন মাছের আসটে গন্ধ নাকেমুখে লাগত, তা আর লাগে না। শেষ সায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মত থলথলে যৌবন না থাক সেও তো যুবতী, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, সায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে ফিরতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কি এক কলকৌশল জেনেছে হীরেণ, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই, আর ছেলে মেয়ে হবে না। এসব কি সত্যি? কখনো হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে? এসব ফাঁকি, এসব যুদ্ধের বোমা, এসব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামী, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোন উপায় নেই। ছাতের আলসেয় উঠবার সময় হীরেণ তাকে আটকায়। এত এলো-মেলো কথার পর এত রাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

আমি যদি মরি তোমার তাতে কি? লক্ষ্মী বলে ঝাঁঝের সঙ্গে ছাড়া পাবার জন্য লড়তে লড়তে হীরেণের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দিয়ে। হীরেণ জানে লক্ষ্মীকে, ভালভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদ কাঁদ হয়ে সে বলে, তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। নিজের কথা ভাবছি? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।

ভালো? তুমি মরলে আমি বাচবো?

বাঁচবে না? আমি মরলে তুমি বাচবে না? দাড়াও বাবু, ভাবতে দাও।

বাঁচবে না? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেণও মরবে অন্য কোন রকমে। তাই হবে বোধ হয়! যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ এগার বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বলতো! একটু ঘুমবো আমি।

ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজ গিজ করা ছেঁড়া ... কে হীরেণের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেণের কথা শোনে।

সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী? আমি বুঝেও বুঝিনি। যা করা দরকার করেও করিনি। মাছিমারা কেরাণীতো। এই রকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।

ওমা, কিসের সময়?

তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তে যাবে না—

আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে? লক্ষ্মী রাগ করে বলে, আমি যাইনি। কিসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।

সাতদিন সময় চেয়ে নেয় হীরেণ, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হ'য়ে, দুঃখে ম্লান হ'য়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে, এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে সে লোকটার।

রাত নটায় হীরেণ বাড়ী ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দুজনে এক সাথে বসে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত এগারটার সময়। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলে ?

পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভূপেন আর কানাই আমারই মত কেরাণী, চেন তো ওদের ? ওদের বাড়ীতে। ভাল কথা, কাল ভোরে ওদের বৌরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।— বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বউ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।

না, ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওগো, তু যাতে তেতালার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারটি কাচ্চা বাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরি-তরকারী, বোতলে ভরা সরষের তেল, ভাঙ্গা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধমণ কি পৌণে এক মণ কয়লা। কচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল হীরেণের শোবার

ঘরে। বাড়তি ছোট ঘুপছি ঘরখানা সাফ করে রাখা হল চাল ডাল তেল নুন তরি-তরকারী। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেণদের রাত্রের এঁটো বাসন মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলিটা চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড় স্টসপেনটা।

আমাদেরি কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দু'জন ·ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী? জানি খাও। কে না খায় চা?

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন ত্মাখে আবোল তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে? কিন্তু কোন প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা তা কথার ব্যাখা শুনে বুঝতে তার ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশেপাশে থাকে। তার মত গরীব কেরাণীর বৌ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোট ঘরটায় জমা করেছে নিজেদের সঙ্গে আনা জিনিষের সঙ্গে। লতিকা বলে, বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ীর খাওয়ার জিনিষ বাসনপত্র রাখবার জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘরটা ছোট হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাঁড়ার ঘরের কাজ দেবে।

মাধবী বলে, মস্ত রান্নাঘর। দু'শো লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।

অলকা বলে, ভালই হল, তুমিও দলে এলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরও কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা নেই ভালমত, না ভাঁড়ার না রান্নাঘর, কি যন্ত্রণা বল দিকি!

অন্যকাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেণের কাছে জবাব চায়।

ওদের ভাল লাগবে?

লাগবে না? চারবাড়ীর চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চারবাড়ীর একদিনের কয়লা খরচে চারদিন না চলুক, তিনদিন তো চলবে? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চারজনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে একজনের গেলেই চলবে। চারজনের রাঁধার বদলে একজনের রাঁধলেই চলবে—চার দিনে তিন দিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূর থেকে চা খেতে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে? চার পাঁচ হাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা ভাত খাওয়ার বদলে দশ বিশ হাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাৎ। তার তুলনায় সুবিধা কত।

লতিকা আজ রাঁধবে। একা যখন ছিল, নিজের বাড়ীতে রোজ রাঁধতে হত, এখন একদিন রেঁধে সে তিনদিন ছুটি পায়। একদিন মানুষের খাওয়ার মত কিছু যদি রাঁধতো তো দু'দিন কি রাঁধবে, কার পাতে কি দেবে ভেবে পেতোনা,—আজ সে ভাল মাছ তরকারী রাঁধতে পেরেছে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই।

তিনদিন পরে এই চারটি অনাত্মীয় পাড়াপড়শী একান্নবর্তী পরিবারের জন্য রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিনদিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবাড়া না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোর খাটুনি ঢের বেশী রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই

আমায় বাঁচালি। লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিনজনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা তুটোকে সে তুধ খাওয়ায়। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মত, আজ বাঘিনীর মত বাঁচতে শুধু সে রাজী নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।